অগ্নি

"বনফুল"



রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৫৩
পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৫৫, কার্তিক ১৩৫৯

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—১৪. ১১. ৫২

অধ্যাপক জগন্নাথ গুপ্ত

কল্যাণীয়েষু

ভাগলপুর

৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৩

১

অংশুমান স্বপ্ন দেখছে। দিবাস্বপ্ন। জেলে ব'সে ব'সে। দেশের জন্য জেলে এসেছে। একখানা বই পড়তে পেয়েছে—ইলেক্‌ট্রিসিটির ইতিহাস। সেইটে কেন্দ্র ক'রেই স্বপ্ন জাগছে নানা রঙের। দেশের, অন্তরার, রূপকথার। মন উড়ে চলেছে জেলের প্রাচীর ভেদ ক'রে দূরদূরান্তে, অতীতে ভবিষ্যতে আশা-আকাঙ্ক্ষার কল্পলোকে।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই কাছে যাব, ডাক শুনতে পেয়েছি, যাচ্ছি···।" সে চলেছে। অনাদি অনন্ত অতীত থেকে অনাদি অনন্ত ভবিষ্যের দিকে অন্তহীন প্রবাহে। তার চলার বেগ, তার আগ্রহ, তার গতি-ব্যাকুলতা যুগে যুগে উতলা করেছে মানুষকে। মানুষ বোঝে নি ঠিক। বিস্মিত হয়েছে, অনুসন্ধান করেছে। আজও করছে।···

চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে ফিরে থাকে অহরহ। কেন? যীশুখ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগে বৈজ্ঞানিক জন্মেছে। সত্য-আলেয়ার পিছনে ছুটে চলেছে অবিরাম।

চীন দেশের নাবিকেরা সমুদ্র-লঙ্ঘন করছে চুম্বকের সাহায্যে। গ্রীসের হোমার, থেলিস, পাইথাগোরাস, ইউরিপিডিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল—সকলেরই ধ্যানভঙ্গ হয়েছে মাঝে মাঝে চুম্বকের টানে। লুক্রেটিয়াস, সিসেরো অবাক হয়েছে চুম্বকের কাণ্ড দেখে।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই উদ্দেশে চলেছি···" এ কথার অর্থ কিন্তু বোঝে নি তখনও কেউ। বোঝে নি, কিন্তু তার গতি-বেগকে কাজে লাগাতেও ছাড়ে নি।

একজন চীন-সম্রাট বিধ্বস্ত করছেন তাঁর প্রতিপক্ষকে চুম্বকের সাহায্যে দিক নির্ণয় ক'রে। চলেছে ক্রুজেডাররা ধর্ম-যুদ্ধ করতে। যুদ্ধের অবসরে আহরণ করছে চুম্বক-তত্ত্ব শত্রুপক্ষ আরবদের কাছ থেকেই।...গ্রীসের ওরেক্‌ল্‌কে নিয়ন্ত্রিত করছে চুম্বক।...কে রাজা হবে ঠিক করছে শূন্যে অবস্থিত চুম্বকের আংটি টেবিলের উপর বিছানো বর্ণমালার উপর ঘুরে ঘুরে।

রেশমের কাপড় দিয়ে তৃণমণিকে (Amber) ঘষলে তৃণমণি নানাবিধ হালকা জিনিসের টুকরো আকর্ষণ করে। কেন? সুদূর অতীতে প্রাচীন গ্রীসে সবিস্ময়ে মানুষ ভাবছে, নিশ্চয় ওদের মধ্যেও আত্মা আছে। সুপ্ত আত্মা ঘর্ষণে জেগে ওঠে। তৃণমণি আর চুম্বকে দেবতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ ক'রে পূজো করছে কেউ কেউ। বিস্মিত মানবের জাগ্রত অনুসন্ধিৎসা সত্য সন্ধান ক'রে চলেছে তবু। ধার্মিক ধর্ম-তত্ত্ব ভুলে সবিস্ময়ে ভাবছেন। পাদ্রি নিমগ্ন হয়েছেন চুম্বকের গবেষণায়।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, ডাক শুনতে পেয়েছি আমি, যাচ্ছি..." তার গতির স্পন্দন আকুল ক'রে তুলেছে মানুষকে। নানা বিজ্ঞানীর মনে নানা অর্থ বহন করছে। অর্থ অর্থান্তরে পরিণত হচ্ছে। যুগ যুগান্তরে।

রাণী এলিজাবেথের ডাক্তার তিনি। অর্থোপার্জনের দিকে তাঁর মন নেই। ডাক্তারির দিকেও না। রুটির জন্যে ওসব করতে হয়, তাই করা। তাঁর সমস্ত মন প'ড়ে আছে চুম্বকের দিকে। চুম্বকের নানা তথ্য খুঁজছেন, ভাবছেন, লিখছেন। চুম্বক আর বিদ্যুৎ...কি এরা? একই জিনিসের বিভিন্ন প্রকাশ নয়তো? হয়তো...হয়তো...।

সারাজীবন কেটে গেল প্রমাণ সংগ্রহ করতে। হঠাৎ মারা গেলেন একদিন। প্লেগে।

সে চলেছে।

শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে, মেঘ-মেদুর অম্বর, অন্ধকার রাত্রি, ছায়াচ্ছন্ন বনভূমি, সমস্ত তুচ্ছ ক'রে রাধা যখন অভিসারে চলেছিলেন, নিকুঞ্জগৃহে অপেক্ষমাণ পীতবসন বনমালী ছাড়া আর কিছুই যখন তাঁর চেতনা-গোচর ছিল না, নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদুবেণুম্— সেই বাঁশী ছাড়া আর কিছুই যখন তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন না, তখন নিখিল বিশ্বও কি রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে নি? আকাশে বাতাসে চন্দ্রে তারায় শিহরণ কি লাগে নি? কবির মনে জাগে নি কি স্বপ্ন? সেদিনকার স্বপ্ন-প্রবাহই কি আকুল করে নি পরবর্তী যুগের চণ্ডীদাস-জয়দেবকে?

তার গতির ছন্দও স্বপ্ন জাগিয়েছিল।

বেতার-বার্তার স্বপ্ন দেখেছিলেন কেউ কেউ সে যুগেও।

অক্ষ-সংলগ্ন বিরাট এক গন্ধক-গোলক বস্ত্রঘর্ষণে বিদ্যুতায়িত হয়ে উঠেছে। সশব্দে খানিকটা আলো ছিটকে পড়ল। বিস্ময়ে চমকে উঠলেন আবিষ্কারক। যন্ত্র-যোগে প্রথম বিদ্যুৎস্ফুরণ।

"যাচ্ছি...যাচ্ছি...যাচ্ছি..."

অপরা-তড়িৎ কেবলই মিলতে চায় পরা-তড়িতের সঙ্গে।

রহস্য-লোকে আলোকপাত হতে লাগল ক্রমশ। টোয়াইন স্থতো দিয়ে পরীক্ষা ক'রে চমকে গেলেন একজন। স্থতো বেয়েও বিদ্যুতের তরঙ্গ চলে। সাত শো পঁয়ষট্টি ফিট দূরেও বিদ্যুতের অস্তিত্ব দেখতে পেলেন তিনি। কৌতূহল জাগল, মানুষের শরীরের ভিতর দিয়েও এর গতিবিধি আছে নাকি? ছোট ছেলেদের উঁচুতে ঝুলিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন, তাদের শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করে কি না! ছোট ছেলেরা তাঁকে দেখলেই পালাত। মুরগী নিয়ে পড়লেন শেষটা। সারাজীবন ধ'রে হাতড়ে গেছেন। রহস্যের পর রহস্য, নিত্য নূতন রহস্য। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়েও বলছেন, টুকে নাও, টুকে নাও। অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু পেয়েছি, প্রকাশ ক'রে যেতে পারলাম না। টুকে নাও—শিগগির—। বলতে বলতেই অন্তিম নিশ্বাস পড়ল।

এল আবার নূতন মানুষ। বাজল নূতন স্থর তার কানে। চোখে ফুটল নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী। দু রকম বিদ্যুৎ আছে—এক রকম কাচ থেকে হয়, আর এক রকম রজন থেকে।

চুম্বক বিদ্যুৎ—কি এরা? সুপ্ত আত্মা? দেবতার প্রকাশ? অশ্রুতিগোচর স্থর কিন্তু বাজতেই লাগল—"যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাবই।" শুনতে পেলে না কেউ। বিচলিত হ'ল তবু নানাভাবে।

কৃষ্ণের বাঁশী বাজে, তবু যেতে পারে না রাধা। জটিলা কুটিলা আয়ান ঘোষ। রাজপ্রাসাদে ব'সে কাঁদে জাহানারা। নূরমহলের চামেলীকুঞ্জে বর্ষা নেবেছে। সমস্ত অন্তর গ'লে পড়ছে যেন। "ফুলেরা,

ডুলেরা, কোথা তুমি? আমরা জলাশয়, তোমরা মরাল। কেন দূরে স'রে আছ এখনও?" জাহানারা কাঁদে, কিন্তু যেতে পারে না। বাধা দুস্তর। জাহানারা পাতশাহ বেগম, ডুলেরা সামান্য গায়ক মাত্র। সব বাধা অতিক্রম করা যায় না।

...সব জিনিস বিদ্যুৎ-পরিবাহী নয়—আবিষ্কার করলেন একজন।

দেখা যায়, কিন্তু রাখা যায় না। কাছে আসে, কিন্তু থাকে না। বাসনালোলুপ মানুষের চিত্ত উন্মুখ হয়ে ওঠে। বাসনার বহ্নিতে ইন্ধন যোগায় বুদ্ধি। চিরকাল যুগিয়েছে।

ঘোড়া গরু কুকুর হরিণ পাখি বনচর জলচর খেচর—সমস্ত কিছু উৎসুক করেছিল একদিন মানব-মনীষাকে। এদেরও দেখা যেত, কিন্তু রাখা যেত না। কাছে আসত, কিন্তু ধরা দিত না। মানুষ ফাঁদ পাততে শিখল। খাদ্যের লোভে, সঙ্গীর লোভে, অসংখ্য অদৃশ্য প্রবৃত্তির অমোঘ তাড়ানায় দলে দলে ধরা পড়ল প্রলুব্ধ পশুর দল। আয়ত্তাতীত ছিল যারা, আয়ত্তাধীন হ'ল। বন্য মানব সভ্য হ'ল। বন্য-পশুর দল ঢুকল এসে মানবনির্মিত পশুশালায়। গ'ড়ে উঠল কৃষি-সভ্যতা।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি..."

সেও যেতে চায়। সুযোগ পেলেই চ'লে যায়। সুযোগ পায় না কিন্তু সব সময়ে। কাচ বিদ্যুৎ-পরিবাহী নয়। কাচের কারাগারে বন্দী করলে পালাতে পারে না সে। মানুষ পশুশালা তৈরি করেছিল, হারেম তৈরি করেছিল, লিডেন জারও করলে। কাচের কারাগারে বন্দী হ'ল সে। হঠাৎ অংশুমানের মনে হ'ল, অন্তরাও তো বন্দী হয়ে আছে বিরাট একটা সামাজিক লিডেন জারে।

প্রথম লিডেন জার আবিষ্কারক প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছিলেন।

ধাক্কা দিয়ে পালিয়েছিল সে। প্রথম বন্দিনী মানবীও হয়তো প্রচণ্ড ধাক্কা দেয় তার প্রথম অপহারককে। বন্য মানবীর মনে কি প্রেম ছিল না? "সে কি কুক্কুরীর মত বলিষ্ঠতমের কাছেই আত্মসমর্পণ করত জৈবিক প্রেরণায়?" বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। বরং এই কথাই ভাবতে ইচ্ছে করে, আজও যেমন সে প্রেমে পড়ে, তখনও পড়ত। বিচার-বুদ্ধির মানদণ্ডকে অগ্রাহ্য ক'রে অকারণে তার সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হয়ে উদ্যত একটি বিশেষ মানুষের জন্য। সে সুন্দর ব'লে নয়, ধনী ব'লে নয়, বলিষ্ঠ ব'লে নয়—সে সে ব'লে। তার বিশেষ একটি রূপ বিশেষ ক'রে তার চোখেই পড়েছিল ব'লে।

অন্তরা কি দেখেছিল তার মধ্যে? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অংশুমান। মনে হ'ল, একটা সত্যের আভাস পেয়েছে সে। জেলে এই একটি মাত্র বই পেয়েছে সে পড়বার জন্যে। খবরের কাগজও আসে—ইংরেজ-সম্পাদিত দৈনিক একখানা। এই বইটাই কিন্তু পেয়ে বসেছে তাকে। এর মধ্যেই অভিনব কল্পনার খোরাক পেয়েছে সে। প্রেমের আকর্ষণই সবচেয়ে বড় আকর্ষণ পৃথিবীতে। অপরা-তড়িৎ পরা-তড়িতের দিকে ছুটে চলেছে কিসের আকর্ষণে? প্রেমের? কে জানে!

খবরের কাগজ দিয়ে গেল। ইলেকট্রিসিটির ইতিহাস মুড়ে রেখে খবরের কাগজখানা খুললে সে। মিনিট খানেক পরে হঠাৎ তার গালে ঠাস ক'রে চড় মারলে কে যেন একটা। খবরের কাগজটা তাড়াতাড়ি নাবিয়ে রেখে দিলে সে। না, খবরের কাগজ সে পড়বে না। মিথ্যের ভরতি।

"ও, খবরের কাগজ পড়বে না? শোন তবে। তুমি চোর, তোমার বাবা চোর, তোমার চোদ্দ পুরুষ চোর। এদের জুতো-পায়ের

ধুলো মাথায় পড়াতে তবে তোমরা উদ্ধার হয়েছ। তুমি পাজি, তোমার বাবা পাজি, তোমার চোদ্দ পুরুষ পাজি। এদের সংস্পর্শে এসে তবে তোমরা ভদ্র হয়েছ। তুমি মূর্খ, তোমার বাবা মূর্খ, তোমার চোদ্দ পুরুষ মূর্খ। এদের কাছে লেখাপড়া শিখে তবে তোমরা মানুষ হয়েছ…"

তারস্বরে চিৎকার করছে কানের কাছে। নির্বাক হয়ে শুনে যেতে হচ্ছে। হাত পা মুখ সব বাঁধা। চিৎকার করছে নিজের লোকেরাই—নিজের বাবা, নিজের ভাই, নিজের বন্ধু। কেউ চিৎকার করছে চরিত্র-ভ্রষ্ট হয়েছে ব'লে, কেউ চাবুকের চোটে, কেউ বকশিশের লোভে। চিৎকার চলেছে দিনরাত। হিমালয় থেকে কুমারীকা পর্যন্ত কোথাও বাদ নেই। তুমুল চিৎকার…বিরাট চিৎকার…চাবুকের চোটে চিৎকার করছে…বকশিশের লোভে…

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। উঃ, কি দারুণ দুঃস্বপ্ন! চোখ চেয়ে দেখলে একবার, চারিদিকে অন্ধকার। চোখ বুজে পাশ ফিরে শুল। ঘুম আসছে না। তার সমস্ত চিত্ত জুড়ে একটি কথাই জাগছে সারা দিন ধ'রে। বিজ্ঞানের এত আবিষ্কার শুধু কি মানব-পশুর পাশবিক শক্তিকে বাড়াবার জন্যেই? প্রেম নয়, হিংসাই কি তার পরিণতি? অশ্রুরার মুখখানা মনের মধ্যে ফুটে উঠল আবার। লজ্জিত হ'ল একটু।

"আমার আবিষ্কারের আসল সত্যটা তো তুমি জান।" চমকে উঠল অংশুমান। একটি হাস্যদীপ্ত মুখ চেয়ে আছে তার দিকে। তীক্ষ্ণ নাসা, আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু, প্রশস্ত ললাট। মাথার সামনের দিকে টাক। ভয় পেয়ে গেল সে।

কে আপনি?

আমি গ্যাল্‌ভানি। তুমি কষ্ট পাচ্ছ, তাই তোমায় সান্ত্বনা দিতে

এসেছি। ভালবেসেছ, তার জন্যে লজ্জা কি? ভালবাসাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। আমি ভালবেসেছিলাম ব'লেই অতবড় আবিষ্কারটা ক'রে ফেলতে পারলাম। স্ত্রীর জন্যে নিজের হাতে যদি ব্যাঙের ঝোল রাঁধতে না যেতাম, তা হ'লে হয়তো কিছুই হ'ত না···

আর একজন এসে দাঁড়ালেন।

ঠিক বলেছ। বিয়ে না করলে আমিও হয়তো বৈজ্ঞানিক হতাম না। মাদামোয়াজেল জুলিকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম ব'লেই উপার্জনের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক হতে হ'ল। তা না হ'লে হয়তো ল্যাটিন কবিতা নিয়েই মেতে থাকতাম সারা জীবন···

একটু মুচকি হেসে গ্যালভানি চ'লে গেলেন। অংশুমান বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল দ্বিতীয় লোকটির মুখের দিকে। একমাথা কোঁকড়ানো বড় বড় চুল। বড় বড় নীল চোখে প্রশান্ত হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি। বলিষ্ঠ নাক, পুরু ঠোঁট। প্রকাণ্ড কলারওলা বুক-খোলা জামা গায়ে। গলায় একটা মাফলার জড়ানো।

আপনি···?

আমি অ্যাম্পিয়র। আমাদের জীবন-চরিত নিয়ে তন্ময় হয়ে আলোচনা করছ তুমি, তাই একটা সাড়া প'ড়ে গেছে আমাদের মধ্যে। আমরা অনেকেই আসব তোমার কাছে। ভয় পেয়ো না। তার পর একটু হেসে বললেন, ভয় পাবার ছেলে অবশ্য তুমি নও। যা কাণ্ড করেছ! কাণ্ডটা যে কত ভয়ানক তা আমার অজানা নেই, ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনের মধ্যে আমি মানুষ। কিন্তু হ্যাঁ, যে কথাটা বলতে এসেছিলাম, তুমি যা ভাবছিলে আজ, যেটাকে সত্যের আভাস ব'লে মনে হচ্ছিল তোমার, সেটা বেশ নতুন কথা, হয়তো সত্য কথাই।

'হয়তো' বলছেন কেন?

সত্যের নানা মূর্তি—কোন্‌টা ঠিক তা কি ক'রে বলব? এই দেখ না, ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনকে প্রথমে সত্যের বড় একটা প্রকাশ ব'লে মনে হয়েছিল আমার, কিন্তু তারা যখন আমার বাবাকে কেটে ফেললে, তখন আমি মুষড়ে গেলাম। সত্যের চেহারা গেল বদলে। হোরেসের ওড টু লিসিনিয়াস তখন একমাত্র সত্য ব'লে মনে হতে লাগল, তার জোরেই বেঁচে উঠলাম আবার। আসল কথা কি জান, যেটাকে সত্য ব'লে মনে হচ্ছে, সেইটেকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাক, যতক্ষণ না সেটা মিথ্যায় রূপান্তরিত হয়।

চোখ দুটো হাসিতে জ্বলজ্বল করতে লাগল। অকস্মাৎ অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন তিনি। অংশুমান প্রথমে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু ভয় কেটে গেল তার। মনে পড়ল, ঠাকুমা একদিন দেখা দিয়েছিলেন তাকে স্কুলে টিফিনের সময়। পরলোক আছে। মানুষ মরে না, কেউ মরে না।

সোৎসাহে বিছানায় উঠে বসল সে। চতুর্দিকে অন্ধকার। অন্ধকারের দিকেই নির্নিমেষে চেয়ে রইল। দেখতে পেল, অন্ধকারের বুক চিরে বিরাট একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রসারিত হয়ে রয়েছে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে। সেই প্রদীপ্ত ক্ষুরধার আলোক-রেখা ধ'রে চলেছে অসংখ্য নরনারীর জ্যোতির্ময় মিছিল।

২

বাইরের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ নির্মেঘ। অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলছে। সহস্রপাদ সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ পুরুষের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে জ্বলছে যেন অনন্তকালের অগ্নিদীপ্ত ইতিহাস। মাঠের মাঝখানে বটগাছটাকে ঘিরে

খদ্যোতকুল শুরু করেছে অগ্ন্যুৎসব। গাঢ় তমিস্রা ভেদ ক'রে পেচকের কর্কশ রব প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল, তা সঙ্গীতে রূপান্তরিত হ'ল পেচকের কর্ণে। অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর রাত্রি গম্ভীর। সাবধানসঞ্চরণে চলেছে শ্বাপদ, তস্কর, যোগী, ভোগী, দৃশ্য অদৃশ্য অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য উদ্দেশ্যে স্মরণাতীত কাল থেকে। আকাশের অগ্নি মর্ত্যের মৃত্তিকায় নেমে লীলায়িত হয়েছে নব নব রূপে নব নব প্রেরণায়। অন্ধকার পুরীর রহস্যলোকে রূপায়িত হচ্ছে চিরন্তন স্বপ্ন।

রোজ যেমন হয়।

৩

প্রতিদিনের মত তার পরদিনেও যথারীতি জেরা শুরু হয়ে গেল। সি. আই. ডি. দারোগাটি বিনয়ের অবতার। একমুখ হেসে পকেট থেকে পানের ডিবে বার ক'রে একসঙ্গে গোটা চারেক পান মুখে পুরে ফেললেন। তাব পর ডিবেটি অংশুমানেব দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন, আসুন।

আমি নেব না। ধন্যবাদ।

আজও নেবেন ন ?

অংশুমান চুপ ক'রে রইল।

দারোগা সাহেব তর্জনীতে খানিকটা চুন লাগিয়ে নীচের দাঁত দিয়ে সেটা কুরে তুলে নিলেন। জরদা খেলেন একটু। তার পর উঠে জানলা দিয়ে পিক ফেললেন একবার।

আপনি গোড়া থেকেই একটা ভুল করছেন অংশুমানবাবু। আপনি ধ'রে নিয়েছেন যে, আমরা আপনার শত্রুপক্ষ। গভর্মেণ্ট আপনার

শত্রু হতে পারে, আপনারা নিজেরাই শত্রুতা করেছেন তার সঙ্গে; কিন্তু আমরা আপনার শত্রু নই, অন্তত আমি নই। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি, যাতে আপনাদের সুবিধে হয়। হাস্যদীপ্ত চক্ষু মেলে চেয়ে রইলেন।

অংশুমান নীরব।

আপনার সঙ্গে আর কে কে ছিল—এই খবরটুকু পেলেই আপনাকে ছেড়ে দেব আমরা। আপনি যে নির্দোষ সে খবর আমরা পেয়েছি। কিন্তু দোষীকেও তো ধরতে হবে। আপনি সে বিষয়ে একটু সাহায্য করুন আমাদের শুধু। সেইজন্যেই আপনাকে আটকে রাখা। নাম কটা ব'লে দিন, বাস্।

আমি তো বলেছি, আমি কিছু জানি না।

দেখুন, ও-সব কথা ব'লে ভোলাতে পারবেন না আমাদের। আপনি যে জানেন তা আমরা জানি।

অংশুমান চুপ ক'রে রইল।

আপনি শিক্ষিত লোক, আপনার অন্তত আইনকে সাহায্য করা উচিত। সমাজকে রক্ষা করবার জন্যেই তো আইন, আপনার অন্তত সে আইনের মর্যাদা রক্ষা করা কর্তব্য। একজন লোককে নিষ্ঠুরভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ন্যায়ত হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়া আপনারও কর্তব্য নয় কি? জাস্টিস ব'লে একটা জিনিস আছে তো!

হঠাৎ গ্রীক দার্শনিকের কথাগুলো মনে প'ড়ে গেল তার। লিস্‌ন্ দেন, আই প্রোক্লেম দ্যাট মাইট ইজ রাইট অ্যাণ্ড জাস্টিস ইজ দি ইন্‌টারেস্ট অফ দি স্ট্রঙ্গার···। সঙ্গে সঙ্গে সেই অর্ধদগ্ধ ডেপুটিটার মুখখানাও মনে পড়ল। হাত-পা-মুখ বেঁধে টাঙিয়ে পোড়ানো হয়েছিল তাকে পায়ের দিক থেকে। তার সেই ঠিকরে-বেরিয়ে-আসা লাল বড়

চোখ দুটো এখনও যেন চেয়ে আছে তার দিকে। তারও তো মা বউ ছেলে মেয়ে আছে! তারা কি করছে এখন? তাদের দুঃখে মনটা দ্রবীভূত হচ্ছিল। কিন্তু বহু অসহায় আর্ত নারীকণ্ঠের চিৎকার আবার বেজে উঠল কানে সহসা।···দলে দলে পাঠান-সৈন্য ঘরে ঘরে ঢুকে নারী-ধর্ষণ করছে ওই ডেপুটিটার হুকুমে।

একমুখ হেসে দারোগাবাবু আবার প্রশ্ন করলেন, বেশ, না হয় ধ'রেই নিলাম, আপনি কিছু জানেন না। আপনি কাকে সন্দেহ করেন তাও বলুন অন্তত।

অংশুমান প্রস্তরমূর্তিবৎ ব'সে রইল, কোনও উত্তর দিলে না।

৪

জেলের বাইরে প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের উপর বিশাল একটা শিরীষগাছ। তার উঁচু ডালে ব'সে একটা দাঁড়কাক একটানা ডেকে চলেছে কা—কা—কা—কা—কা—কা···। আর একটি ডালে পাশাপাশি ব'সে আছে একজোড়া ঘুঘু। স্তিমিত-নয়ন নির্বিকার একটি ঘুঘু হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে বসল, ঘাড় বেঁকিয়ে ঠোঁট দিয়ে পিঠ চুলকোতে লাগল। শিরীষগাছের পত্রপুঞ্জে ফুঠেছে মরকত-মণির আভা। কাছেই ছোট্ট এক টুকরো ঢালু জমি অপরূপ হয়ে উঠেছে নবদূর্বাদলশ্যাম কান্তিতে। খঞ্জন-দম্পতি মনের আনন্দে চ'রে বেড়াচ্ছে তার উপরে। তাদের লঘুচপল গতি, পুচ্ছের আন্দোলন নিঃশব্দ ছন্দে স্পন্দিত করছে পারিপার্শ্বিককে। জলে স্থলে আকাশে বাতাসে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরের স্বর্ণকান্তি সমুদ্ভাসিত। দ্বিপ্রহরের উগ্র জ্যোতিতে চকচক

করছে বেঅনেটের ডগাটা। জেলের গেটে খাকী পোশাক প'রে নিঃশব্দে পদচারণ করছে পাঠান প্রহরী।

৫

অপমানে সমস্ত চিত্ত অবসন্ন, হতাশার লক্ষ কণ্টকে বর্তমান-ভবিষ্যৎ সমাকীর্ণ। তবু সেই কণ্টকবনে ফুল ফুটে রয়েছে একটি। অম্লান কুসুম। অস্তরা।

অস্তরাকে ভালবেসেছিলাম কেন—ভাবছিল অংশুমান। ভালবাসার অর্থ কি? কুসুমের কানে কানে মধুকরের যে গুঞ্জন, কমলকোরকের সুপ্ত পাপড়িতে সূর্যালোকের যে জাগরণমন্ত্র, তাই কি ভালবাসা? লজ্জাবতীর মত স্পর্শকাতর, সূর্যমুখীর মত উন্মুখ, আলোকের মত স্বচ্ছ, অন্ধকারের মত নিবিড় কি এ? সহসা তার মনে হ'ল, অস্তরাকে ভালবেসে কি অন্যায় করেছি, অবনত করেছি নিজেকে? যে ভালবাসাকে কোনদিন বিবাহের বন্ধনে বাঁধা যাবে না, যা অসামাজিক, অযৌক্তিক, অহেতুক···। অহেতুক? হঠাৎ মনে হ'ল। অস্তরার সমস্ত মূর্তিটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মানসপটে। ওই তন্বী স্বর্ণলতা, ওকে ভালবাসার হেতু নেই কোনও? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অংশুমান।··· নিশীথ রজনীর তারাভরা আকাশ···দিগন্ত-বিস্তৃত পল্লীপ্রান্তরে ইন্দ্রধনুশোভিত ক্ষান্ত-বর্ষণ মেঘপুঞ্জ···বিশাল সাগরের অগণিত ঊর্মি-শিখরে অনাবিল জ্যোৎস্নার লাস্য-লীলা···ছবির পর ছবি জাগতে লাগল মনে।

সহসা মনে হ'ল, সহসা যেন দেখতে পেল সে, দান্তে ছুটে চলেছে বিয়াত্রিচের পিছনে পিছনে নরক পর্যন্ত। নরক···? হ্যাঁ, নরকই

তো। ভালবাসা কি মানুষকে নরকগামী করে? ভাবতে লাগল সে। আমি যা ভোগ করছি এও তো নরক-যন্ত্রণা। অন্তরার জন্যেই তো কারাবরণ করেছি। অন্তরার চক্ষে নিজেকে বীর প্রতিপন্ন করবার জন্যেই তো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এই পাশবিক ঘূর্ণাবর্তে। তার কাছে আস্ফালন করেছিলাম নিজের পৌরুষ-মর্যাদা, সমস্ত ভবিষ্যৎ ভাসিয়ে দিয়ে। প্রদীপ্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে দেখেছিল। কোন মন্তব্য করে নি, কোন উৎসাহ দেয় নি, কিন্তু তার মুগ্ধ দৃষ্টি থেকে যা ক্ষরিত হচ্ছিল তাই যথেষ্ট ছিল আমার পক্ষে। তাকে খুশি করবার জন্যে, তার হৃদয় হরণ করবার জন্যেই জীবনমরণ তুচ্ছ ক'রে মেতে উঠেছিলাম আমি। তার স্মিত হাসি, মৌন জয়ধ্বনি পুরস্কৃত করেছিল আমাকে। ধন্য হয়েছিলাম···কিন্তু তার পরিণাম কি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করা? এই অন্ধকার ঘরটায় একা কাটাতে হবে দিনের পর দিন, কতদিন কে জানে! পরক্ষণেই মনে হ'ল, ওই বিয়াত্রিচের প্রেমই দান্তেকে স্বর্গেও নিয়ে গিয়েছিল শেষে।···রুমঝুম রুমঝুম রুমঝুম···মধুর নূপুররবে অন্ধকার ছন্দিত হয়ে উঠল সহসা।

কে?

আমি বেহুলা। দেবসভায় নৃত্য করছি মৃত স্বামীর গলিত দেহে প্রাণ-সঞ্চার করবার জন্যে।

সব থেমে গেল আবার। স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল অংশুমান। অনেকক্ষণ ব'সে রইল। যখন সচেতন হ'ল, তখন তার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ। অন্তরা ··অন্তরা···অন্তরা···। পরিপূর্ণ চিত্ত-সাগরের প্রত্যেক ঊর্মিটিই অন্তরা, কিন্তু সাগরের অন্তস্তলে স্রোত বইছে। প্রশ্নের, সন্দেহের। অর্থ কি এ ভালবাসার? বহুর মধ্যে এককে, নির্বিশেষের মধ্যে বিশেষকে এমনভাবে আবিষ্কার করলাম কেন? অন্তরার মধ্যে

যে এত মাধুর্য আছে, তা আমার চোখেই ধরা পড়ল কোন্ মন্ত্রে? অর্থ কি এ আবিষ্কারের···

আবিষ্কারের অর্থ বড় রহস্যময়।

ঘাড় ফিরিয়ে অংশুমান দেখলে, অন্ধকার আলোকিত হয়েছে খানিকটা। একটি মুখ ফুটে উঠেছে তার মধ্যে। গোঁফদাড়ি নেই। অতিশয় শুচিস্নিগ্ধ মুখচ্ছবি। চোখাচোখি হতেই সুমিষ্ট হাসি হেসে বললেন, আমি অরস্টেড। তার পর চুপ ক'রে রইলেন।

নীরবতা ঘনিয়ে এল চতুর্দিকে। অরস্টেডের দৃষ্টি থেকে একটা নীরব সান্ত্বনা ক্ষরিত হচ্ছিল যেন। মনে হচ্ছিল, একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নির্মম পেষণে এই যে লক্ষ লক্ষ লোক মরছে, এর জন্যে তিনিই যেন দায়ী, এমনই একটা ভাব ফুটে উঠছিল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে। অংশুমানের দিকে চেয়ে আর একটু হেসে বললেন, আবিষ্কারের কাহিনী বড় রহস্যময়। তার দায়িত্ব বা কৃতিত্ব কারও প্রাপ্য নয়। শিশু যখন আবিষ্কার করে যে, মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ আছে, তখন তার কৃতিত্ব কতটুকু! আবিষ্কার করেই বা সে কি ক'রে, কে ব'লে দেয় তাকে?

হাসিমুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তার পর একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, যে আবিষ্কারের জন্যে আমার এত নাম, তাতে আমার কৃতিত্ব যে কতটুকু তা তো জানই। আমার চোখে পড়েছিল। আমি লেক্‌চার দিচ্ছিলাম, একটা কয়েলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছিল, কাছেই ছিল একটা ম্যাগ্‌নেটিক নিড্‌ল! হঠাৎ সেটা ন'ড়ে উঠল, হঠাৎ আমার চোখে প'ড়ে গেল। প্রথমটা পড়ে নি, কিন্তু যতবারই কয়েলের ভিতর দিয়ে কারেণ্ট গেল, ততবারই নড়ল সেটা। কেউ যেন আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। বিজ্ঞান-জগতে

যেটা যুগান্তকারী আবিষ্কার, সেটা একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র। তার জন্যে আমি দায়ী হতে পারি না—না না, কিছুতেই না।

আর্তনাদ ক'রে উঠলেন যেন, তার পর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর্তনাদটা মনে মনে উপভোগ করলে অংশুমান। কিন্তু পর-মুহূর্তেই মনে ঘনিয়ে এল বিষাদের ছায়া। তার আবিষ্কারটা তো আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়। সে যেচে গিয়ে আলাপ করেছিল। অস্তরার চোখে মুখে কি যেন একটা ছিল। কিছুতেই নিজেকে সম্বরণ করতে পারে নি সে। যদিও তার সামনে একটা কথাও বলতে পারত না, কিন্তু দুর্নিবার আকর্ষণে যেতে হ'ত তাকে প্রত্যহ। তার চোখে নিজেকে বৃহৎ প্রতিপন্ন করবার দুর্নিবার প্রলোভনেই সে···

বাজে চিন্তা ক'রে অকারণ শক্তি ক্ষয় করছ।

এলেন আর একজন। একমাথা ঝাঁকড়া কটা চুল। চমৎকার চোখ দুটি। নাক তীক্ষ্ণ।

অকারণে শক্তি ক্ষয় করছ। তোমার প্রণয়িনীর জন্যে তুমি দেশের কাজে নাব নি, ওটা বাজে কথা, স্রেফ বাজে কথা। দেশই তোমার বরাবর লক্ষ্য, প্রণয়িনীটা উপলক্ষ্য মাত্র। প্রণয়িনীই যদি তোমার লক্ষ্য হ'ত, তা হ'লে তুমি পাঁচিল টপকাতে, ডেপুটি পোড়াতে যেতে না।

একটা চাপা হাসি উঁকি দিচ্ছিল চোখ দুটি থেকে, কিন্তু নিমেষে সেটাকে অবলুপ্ত ক'রে ফুটে উঠল অনুযোগমিশ্রিত ভর্ৎসনা।

কক্ষনও যেতে না। মানুষের জীবনের আসল লক্ষ্য কি অর্থাৎ কোন্ রাস্তায় গেলে তার আত্মা সত্যিই পরিতৃপ্ত হয়, তা প্রথমটা সে বুঝতে পারে না। লেখক ডাক্তার হয়, কবি ব্যবসা করতে যায়, দেশপ্রেমিক নারীপ্রেমে কিংবা যশের নেশায় মশগুল হয়ে পড়ে, কিন্তু

শেষ পর্যন্ত তাকে স্বখাতে ফিরে আসতে হয় বাঙ্গে বগ্যাগুলো স'রে গেলে। এই দেখ না, আমি সোল্‌জার হব ব'লে মেতেছিলাম···

একটু হেসে তারপর বললেন, না মেতে উপায়ও ছিল না। সোল্‌জার হওয়াটাই তখনকার দিনে ফ্যাশান ছিল যে। ফ্যাশান জিনিসটা হাম-জ্বরের মত, ওর কবল এড়ানো শক্ত। কিন্তু পলিটেক্‌নিকের পরীক্ষায় পাস না করলে সেকালে সোল্‌জার হওয়া যেত না। সেই পরীক্ষা দিতে হ'লে অঙ্ক শিখতে হ'ত। অঙ্ক নিয়ে মাতলাম। সেই যে মাতলাম, বাস্‌। ওরা দেখলে, আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো বৃথা। পাঠালে অব্‌জার্‌ভেটরিতে। বিওর সঙ্গে ভাব হ'ল। গ্যাসের রিফ্র্যাক্‌টিং প্রপার্টি নিয়ে পড়লাম। তার পর মেরিডিওনাল মেজার্‌মেণ্ট। পিরেনিজ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে···তুমি তো সব জানই।

একটু চুপ ক'রে আর একটু হেসে বললেন, না, জান না, নিদারুণ শীতে পিরেনিজ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে যখন ভৌগোলিক সঙ্কেত করেছিলাম, তখন আমার কষ্ট হয় নি, আনন্দ হয়েছিল—আমার জীবনচরিতকার সে কথাটা লেখে নি। তার পর পাহাড় থেকে নাববার সঙ্গে সঙ্গে স্প্যানিয়ার্ডরা আমাকে স্পাই ভেবে যখন তাড়া করেছিল, তখনও আমার ভয় হয় নি, অদ্ভুত একটা আনন্দ হচ্ছিল, এমন কি বেল্‌ভার ক্যাস্‌লে পালিয়ে এসে সেং ভণ্ড পাদ্রিটার পাল্লায় পড়লাম যখন, যিনি আমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করেছিলেন, তখনও আমার রাগ হয় নি, মজা লাগছিল। আমার মনের মধ্যে অফুরন্ত নির্ভীক যে আনন্দের ভাণ্ডার ছিল, সে খবর আমার জীবনচরিত থেকে পাও নি তুমি। ওইটে ছিল ব'লেই কাবু করতে পারে নি আমাকে। বিপদ তো কম হয় নি, সবই তো পড়েছ। পাদ্রির কাছ থেকে পালিয়ে পেয়ে গেলাম একখানা অ্যাল্‌জেরিয়ান জাহাজ, কিন্তু কিছুদূর যেতে

না যেতেই পড়লাম আবার একদল স্প্যানিয়ার্ড জলদস্যুর হাতে। তারা আমাকে বন্দী ক'রে নিয়ে এল স্পেনে। প্রথমে রাখলে একটা উইণ্ড-মিলে, তার পর একটা জাহাজের খোলে, প্রায় তোমারই মত অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু দমি নি। ওদেরই একজনের সঙ্গে ভাব ক'রে ফেললাম। হ্যাঁ, ওইটি চাই, দরকার হ'লে শত্রুপক্ষের সঙ্গেও ভাব করা চাই। শত্রুপক্ষের মধ্যেও ভাব করবার মত লোক পাওয়া যায় বইকি। আমি যে লোকটার সঙ্গে ভাব করেছিলাম, সে অতি চমৎকার লোক। এত চমৎকার যে, নিজের গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে আমায় ছাড়িয়ে নিলে, তার পর টিকিট ক'রে তুলে দিলে একটা জাহাজে। কিন্তু কপাল ছিল মন্দ, ঝড় উঠল। আমাদের জাহাজকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে একেবারে আফ্রিকায়। সেখানে আবার স্প্যানিয়ার্ড। কিন্তু এবার ব্যাটারা নিজেদের মধ্যেই এমন মারামারি শুরু ক'রে দিলে যে, আমি পালাবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে ছ মাস পরে দেশে ফিরি। এত কাণ্ড ক'রেও কিন্তু সোল্‌জার হলাম না, কিছুই হলাম না, শেষ পর্যন্ত আমাকে ইলেক্‌ট্রিসিটি আর ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌ নিয়ে পড়তে হ'ল। কয়েলের ভিতর দিয়ে কারেণ্ট গেলে ম্যাগ্‌নেটিক নিড্‌ল ন'ড়ে উঠছে কেন—অরস্টেডের এই আবিষ্কার পেয়ে বসল আমাকে। যতক্ষণ না বার করলাম যে, কয়েলের ভিতর দিয়ে কারেণ্ট গেলে কয়েলটাই ম্যাগ্‌নেট হয়ে যায়, ততক্ষণ আমার শান্তি ছিল না। কিন্তু বার করবার পর কি আনন্দ! তাই বলছি, আনন্দটাই আসল জিনিস, ওটা না থাকলে কিছু হয় না। আমার কিন্তু সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয়েছিল অরোরা বোরিয়ালিস আর ম্যাগ্‌নেটিক স্টর্মের সম্পর্ক আবিষ্কার ক'রে, মানে, হ'ল কি···

অংশুমান সবিস্ময়ে শুনছিল।

আপনি কি আরোগা?

প্রশ্ন শুনে থমকে গেলেন আরোগা। পর-মুহূর্তেই চ'টে গেলেন কথায় বাধা পড়াতে।—আমি কে তা নিয়ে কি দরকার, যা বলছি শোন না। আনন্দটিই আসল জিনিস, ওইটে না থাকলে তলিয়ে যাবে। তুমি ওই যে একটা থিয়োরি খাড়া ক'রে মন গুমরে ব'সে আছ যে, অস্তরার জন্যেই তুমি এত কাণ্ড করেছ, ওটা একদম বাজে কথা। যা তোমার আনন্দকে ম্লান করছে, জানবে তা বাজে জিনিস—বিষবৎ পরিত্যাগ করবে সেটা। তা ছাড়া সত্যিই ওটা বাজে কথা। অস্তরা হয়তো তোমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে—আমি যেমন সোল্‌জার হতে চেয়েছিলাম; কিন্তু দেশই তোমার—

তুমি বড্ড বেশি বকবক করছ। ঘুমুতে দাও না বেচারীকে একটু।—আর একজন এসে দাঁড়ালেন আরোগার পাশে। প্রশস্ত ললাট, সামনের দিকে টাক থাকাতে আরও প্রশস্ত দেখাচ্ছে। মাথার পিছনে ছোট ছোট কাঁচা-পাকা চুল। কাটা কাটা নাক মুখ চোখ। বলিষ্ঠ চেহারা। কিন্তু সমস্ত মুখে বিনীত ভদ্রতা যেন মাখানো।

ঘুমুবে? এর মধ্যেই? এই তো সবে দশটা বেজেছে। অংশুমানের দিকে চেয়ে আরোগা প্রশ্ন করলেন, এঁকে চেনো? তার পর নিজেই উত্তর দিলেন, ইনি স্টার্জন। হ্যাঁ, সেই মুচির ছেলে। এঁরই বাপ কেবল মাছ ধ'রে আর পাখি শিকার ক'রে বেড়াতেন, তাও চুরি ক'রে। পোচিং! ইনিও আর্মিতে ঢুকে কুড়ি বছর কামান দেগেছিলেন। কিন্তু কিচ্ছু হয় নি। হ'ল একদিন, বিরাট এক ঝড় উঠে। বজ্রের গর্জন শুনে আর বিদ্যুতের ঝলকানি দেখে তাক লেগে গেল ভদ্রলোকের। কামান দাগার অবসরে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়াশোনা শুরু করতে হ'ল। প্রথমে গ্রীক ল্যাটিন অঙ্ক, তার পর ইলেকট্রিসিটি

ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌। শেষ পর্যন্ত ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেট তৈরি করতে হ'ল।

না না, আমি—

একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন স্টার্জন। তার পর সামলে নিয়ে বললেন, এস, চল যাই। ও ঘুমুক এখন—

এই কুনো স্বভাবের জন্যেই তুমি মরেছ। তোমার কীর্তিটা লোকে জানতে পারলে না ভাল ক'রে। ওদিকে আমেরিকায় হেন্‌রির জয়জয়কার। আচ্ছা, হেন্‌রি কোথা গেল বল তো? তারও যে আসবার কথা ছিল! আসবে বোধ হয় এখুনি, দাঁড়াও না একটু, বেশ জমানো যাক সবাই মিলে।

না, চল, যাই আমরা।

হেন্‌রির সামনে দাঁড়াতে লজ্জা করছে বুঝি? আমি বলছি, ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটের কীর্তি তোমারই প্রাপ্য, হেন্‌রির নয়। হেন্‌রিও সে কথা স্বীকার করবে। তার সামনে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবার অধিকার আছে তোমার, লজ্জা কি?

আরোগার চোখের দৃষ্টিতে চাপা কৌতুক ফুটে উঠল।

কি যে বলছ, লজ্জা কিসের! তা ছাড়া আমার প্রাপ্য তো আমি পেয়েছি।

কি পেয়েছ?

একটা রূপোর মেডেল। ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেট তৈরি ক'রে বিক্রিও করেছি অনেকগুলো। লেক্‌চারার হয়েছিলাম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়েছিলাম, আবার কি চাই?

চোখ মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল হঠাৎ। যাঁকে লাজুক ব'লে মনে হচ্ছিল, দেখা গেল, তিনি বেশ সপ্রতিভ।

অংশুমান আর থাকতে পারলে না।

আচ্ছা, একটা কথা কি আপনাদের কখনও মনে হয় নি, নেগেটিভ ইলেকট্রিসিটি পজিটিভের দিকে যায় কেন ?

যায় কেন ? যায় ব'লেই যায়, যাওয়াই নিয়ম।—ভ্রূযুগল উত্তোলন ক'রে আরোগ্য বললেন।

স্টার্জন ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রইলেন।

কেন এমন নিয়ম হ'ল ?

আরোগ্য 'শ্রাগ' করলেন। তার পর স্টার্জনের দিকে ফিরে বললেন, তুমি ঠিকই ধরেছ, এর ঘুমোনো দরকার এখন।

অংশুমানকে বললেন, ঘুমোও তুমি। আর যে কথাটা বলতে এসেছিলাম, সেই কথাটা মনে রেখো,—দেশই তোমার আসল প্রেরণা, অন্তরা নয়। একটা বাজে চিন্তা ক'রে মুষড়ে পড়বার দরকার নেই। চললাম। গুড নাইট।

চ'লে গেলেন দুজনেই।

অংশুমানের ঘুম এল না। চোখ বুজে সে শুয়ে রইল চুপ ক'রে। নীরবতা ঘনিয়ে এল আবার চতুর্দিকে। তার পর ধীরে ধীরে গুঞ্জনধ্বনি উঠল। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল ক্রমশ।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি···তোমারই দিকে চলেছি অক্লান্ত গতিতে··সত্য পথে···সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে···"

কে—কে তুমি ?

চিৎকার ক'রে উঠে বসল অংশুমান। কোন উত্তর এল না। হঠাৎ সে দেখতে পেলে, অসংখ্য উজ্জ্বল খদ্যোতপুঞ্জ উড়ে চলেছে অজানা অন্ধকারের দিকে অশ্রান্ত গতিতে তমিস্রাকে তুচ্ছ ক'রে। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। চলেছে অন্তহীন প্রবাহে জ্যোতির বুদ্বুদমালা।

কে ওরা…কি ওরা…? চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। চেষ্টা করতে লাগল ঘুমোবার। ঘুম কিন্তু এল না। বার বার মনে হতে লাগল, সত্যিই কি অন্তরা উপলক্ষ্য মাত্র, দেশই আসল লক্ষ্য…

দুইই এক।

অংশুমান চোখ খুলে দেখলে, আবার দুজন পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছেন। দেখেই চিনতে পারলে, দুজনেরই ছবি অনেকক্ষণ ধ'রে দেখেছিল সে আজ সকালে। হেন্‌রি আর ফ্যারাডে।

ফ্যারাডে হেসে বললেন, আমরা দুজনেই প্রমাণ করেছি যে, দুইই এক। ইলেক্‌ট্রিসিটি আর ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্ একই জিনিসের এ-পিঠ ও-পিঠ। বিদ্যুৎপ্রবাহ লোহার তারকে যেমন চুম্বকে পরিণত করে, চুম্বকও লোহার তারকে তেমনই বিদ্যুতায়িত করতে পারে। শুধু তাই নয়, এখন আমরা বুঝেছি, একই শক্তির বহু রূপ। বিদ্যুৎ, চুম্বক, আলো—একই শক্তির বিভিন্ন লীলা। ক্লোরিন গ্যাস যখন লিকুইড হ'ল, তখনও তাই দেখলাম। তোমার প্রেমও তাই। অন্তরা আর দেশ যাকেই ভালবাস, জিনিসটা এক। এটাও এনার্জির আর একটা রূপ বোধ হয়। হঠাৎ থেমে গেলেন ফ্যারাডে, ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, তার পর বললেন, আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গতি—দ্রুত গতি, নিরবচ্ছিন্ন আবর্তন। চুম্বকের ক্ষেত্রে দ্রুতবেগে আবর্তিত হ'লে সামান্য ধাতুখণ্ডেও বিদ্যুৎতরঙ্গ বইবে। দ্রুতগামী বিদ্যুৎতরঙ্গের সমীপবর্তী হ'লে সামান্য লৌহখণ্ডও পরিণত হবে চুম্বকে। সামান্য কামারের ছেলে মাইকেল ফ্যারাডেও জীবনের ঘূর্ণাবর্তে দ্রুতবেগে আবর্তিত হতে হতে চুম্বক হয়ে উঠেছিল, তাই না তার টানে স্বয়ং সার্ হাম্‌ফ্রি ডেভি এসে হাজির হয়েছিলেন তার দ্বারে। হা-হা-হা-হা—

উচ্চকণ্ঠে হেসে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ফ্যারাডে।

জোসেফ হেন্‌রি দাঁড়িয়ে রইলেন নিস্পন্দ হয়ে। যেন অ্যাপোলো। ঋজু, বলিষ্ঠ, সৌম্য, শান্ত। চোখের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে মনীষা ও মাধুর্যের মিলন-মহিমা। স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন তিনি অনেকক্ষণ অংশুমানের দিকে।

তার পর বললেন, ফ্যারাডে যা বললেন, তা ঠিক। গতিই আসল। চুম্বকের আবহাওয়ায় অবিরাম বিঘূর্ণিত না হ'লে বিদ্যুৎপ্রবাহ বইত না, আর তা না বইলে গ'ড়ে উঠত না বর্তমান জগৎ। সবই ঠিক। কিন্তু এটাও মনে রাখা উচিত শুধু গতি নয়, গতিপথেরও বিশেষ মূল্য আছে একটা। একই বৈদ্যুতিক শক্তি সোজা তারে যতটা স্পার্ক দেয় তার চেয়ে ঢের বেশি দেয় তারটা কয়েল ক'রে নিলে। তোমাদের পরাধীনতার মোচড় তেমন জোরালো হয় নি বোধ হয়, তার জোরে স্পার্ক দিতে পারছ না···। তাঁর গম্ভীর মুখ হাস্যস্নিগ্ধ হয়ে উঠল।

জোরালো হয় নি? এর চেয়ে আর কি হবে?—ব'লে উঠল অংশুমান।

তা হ'লে বোধ হয় লীক করছে কোনখান থেকে। লীক করলে জোর ক'মে যায়। স্টার্জনের ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেট যে বেশি ভারী জিনিস তুলতে পারে নি, তার কারণ তারগুলো ইন্‌স্যুলেটেড ছিল না। আমি পাড়ার মেয়েদের খোশামোদ ক'রে প্রত্যেক তারের গায়ে সিল্কের ওয়াড় পরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার ম্যাগ্‌নেট তাই জোরালো হয়েছিল। তোমরা শক্তিকে সংহত করতে পারছ না বোধ হয়। বাজে বক্তৃতার অকারণ লম্ফঝম্পে অনেক শক্তি নষ্ট হচ্ছে সম্ভবত···

কিসের শক্তি আপনি বলছেন?

ধর, প্রেমেরই। ও, কিন্তু আর একটা ব্যাপারও হতে পারে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

স্ক্রীনিং এফেক্‌ট্‌ হতে পারে। প্রাইমারি কয়েল আর সেকেণ্ডারি কয়েলের মাঝখানে যে কোন একটা ধাতুর চাদর রাখলে কারেণ্টের জোর ক'মে যায়। অস্তরা আর তোমার মাঝখানে সমাজটা স্ক্রীনের কাজ করছে হয়তো, কিংবা হয়তো, তোমার দ্বিধা। সিমিলারলি, দেশ আর তোমার মাঝখানে বিদেশী শাসন, কিংবা তোমাদের তামসিকতা, কিংবা সাম্‌থিং, ঠিক জানি না···এইগুলো অনুসন্ধান করা দরকার। আচ্ছা, ধর— না থাক্‌, রাত হয়েছে, ঘুমোও তুমি।

আচ্ছা, অস্তরাকে ভালবেসেছি ব'লে দেশের প্রতি আমার একনিষ্ঠতা কি ক'মে যেতে পারে?—প্রশ্নটা না ক'রে পারলে না অংশুমান।

তা কখনও যায় নাকি? এই আমারই বেলা দেখ না, আমি তো জীবনে একনিষ্ঠ হতে পারি নি। ছেলেবেলায় একনিষ্ঠ কবি ছিলাম, কাব্য নিয়ে উন্মত্ত হয়ে থাকতাম। সেকালের এমন কোন নভেল নাটক ছিল না, যা পড়ি নি। শুধু নিজে পড়তাম না, আর পাঁচজনকে ডেকে প'ড়ে শোনাতাম। থিয়েটার করা একটা বাতিক ছিল। যেখানেই সৃষ্টির মহিমা দেখেছি, মন মেতে উঠেছে। গ্রেগারির বইখানাও যেই হাতে পড়ল, বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল মন। কল্পলোকের নূতন একটা দ্বার খুলে গেল যেন। কাব্য ভাল লাগত ব'লে বৈজ্ঞানিক হতে আমার আটকায় নি। বস্তুত বড় বৈজ্ঞানিক আর বড় কবিতে কোন তফাতই দেখতে পাই না আমি। অস্তরার প্রতি তোমার প্রেম দেশ-প্রেমকে ম্লান করবে কেন? বিজ্ঞানের উপমা দিয়েই যদি বলি, বেশি তার জড়ালে ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটের শক্তি যদি বাড়ে—দেশের বেশি লোককে ভালবাসলে দেশপ্রেমই বা বাড়বে না কেন? দেশ মানে—দেশের মাটি নয়, দেশের মানুষ। দেশের মানুষকে ভালবাসি ব'লেই

দেশের মাটি ফুল ফল কীট পতঙ্গ পর্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে,—মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ তো ভালবাসা দিয়েই হয়। সেই যোগসূত্র দিয়েই তুমি তোমার আদর্শ, তোমার আবেগ সুপ্রসারিত করতে পার নিত্য নূতন লোককে ভালবেসে। যত বেশি লোককে ভালবাসবে, তত বেশি জোর পাবে। আর একটা বৈজ্ঞানিক উপমা মনে পড়ছে। অ্যাম্‌পিয়রই প্রথমে ভেবেছিল যে, বিদ্যুতের তরঙ্গযোগে দূরে খবর পাঠানো সম্ভব। চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু হ'ল না, তার তরঙ্গের জোর ছিল না ব'লে। বার্লো দেখিয়ে দিলে যে, দু শো ফিটের বেশি যাবার শক্তি নেই তার। আমি কিন্তু আমার ইন্‌টেন্‌সিটি ব্যাটারি আর ইন্‌টেন্‌সিটি ম্যাগ্‌নেট দিয়ে এক মাইলের বেশি দূর পর্যন্ত কারেন্ট নিয়ে গিয়েছিলাম। এক মাইল দূরে গিয়ে আমার কারেন্ট ম্যাগ্‌নেটিক নিড্‌লটিকে ঘুরিয়ে ঠিক ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছিল।

কৃতিত্বের আনন্দে চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তা হ'লে প্রেমের একনিষ্ঠতা ব'লে আপনি কিছু মানেন না?

মানি বইকি। কাব্য পড়েছি, প্রেমের একনিষ্ঠতা মানি না? কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, শক্তি শুধু প্রেম নয়। একটি খাবারের প্রতি তুমি যদি একনিষ্ঠ থাকতে পার, তার জন্যে বাহবা অবশ্যই তোমার প্রাপ্য। কিন্তু একাধিক খাবার খেয়ে হজম করতে পারলে একনিষ্ঠতা থাকবে না বটে, কিন্তু শক্তি বাড়বে। তা ছাড়া প্রথম জীবনে মানসিক একনিষ্ঠতার অর্থ আছে নাকি কোন? যতটা পার, যেখান থেকে পার, আহরণ ক'রে যাও। সমস্ত পরিপাক ক'রে প্রাণবন্ত জীবনীশক্তির সংহত একনিষ্ঠতা পরে হবে। আমি প্রথম জীবনে কাব্য নিয়ে ছিলাম, তার পর বিজ্ঞান। বিজ্ঞান-জগতেও এক রাস্তায় চলি নি। ইলেক্‌ট্রিসিটি নিয়ে ছিলাম অনেক দিন। তার পর

আবিষ্কার করলাম থার্মো-টেলিস্কোপ। সূর্যের গায়ে যে কালো কালো স্পট আছে, তাদের টেম্পারেচার কত—তাই নিয়ে কাটল কিছুদিন। তার পর কোহিশন অব লিকুইড্‌স্‌, ফস্‌ফরেসেন্‌স্‌, শব্দ-বিজ্ঞান—কত কি করেছি, এখনও করছি, কিন্তু লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়েছে ব'লে তো মনে হয় না। না না, ওসব ভুল ভাবছ, অন্তরা তোমার দেশপ্রেমের ক্ষতি করতে পারবে না। ঘুমোও, অনেক রাত হয়েছে, চললাম…

মিলিয়ে গেলেন।

অংশুমানের মনের সমস্ত গ্লানি অপসারিত হয়ে গেল। অন্তরার ভালবাসাটা কাঁটার মত বিঁধে ছিল মনে। দেখতে দেখতে ফুল হয়ে ফুটে উঠল সেটা। চোখ বুজে সে স্বপ্ন দেখতে লাগল, অন্তরাই যেন দেশ-মাতৃকা।

"যাচ্ছি—যাচ্ছি—তোমারই কাছে…"

ধীরে ধীরে গুঞ্জন উঠল আবার।

৬

ছোট বড় স্তূপ স্তর, নানাবিধ মেঘপুঞ্জ নিঃশব্দ মন্থর গতিতে একত্রিত হয়েছে পূর্বদিগন্তে। রাত্রি দ্বিপ্রহর। চতুর্দিক স্তব্ধ। চক্রবালরেখা-সংলগ্ন বৃক্ষশ্রেণী স্তম্ভিত হয়ে আছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, কাল-কালিন্দীর কৃষ্ণতরঙ্গমালা মূর্ত হয়ে গেছে যেন সহসা অদ্ভুত কোন মন্ত্রবলে। বেতসবনে অস্ফুট মর্মরধ্বনি উঠছে একটা। অন্ধকার অন্তরের অব্যক্ত বেদনা মূর্ত হতে চাইছে যেন সে অস্পষ্টতায়। কিসের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করছে সব? সারি সারি বাদুড় উড়ে চলেছে। বর্ষা-স্নাত বনানীর বন্য-মদির গন্ধে অন্ধকার ভারাক্রান্ত। ঝিল্লী ডাকছে না।

সমস্ত নিঃশব্দ। সেই নিঃশব্দতার পটভূমিকায় অস্ফুট মর্মর-ধ্বনির সূক্ষ্মজাল সূক্ষ্মতর হচ্ছে ক্রমশ অন্ধকারের নিবিড়তায়। কি যেন একটা আসন্ন! সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে সবাই। সহসা মেঘের কোলে কোলে লাগল জরির পাড়, বৃক্ষশ্রেণীর শিখরে শিখরে জাগল জ্যোতির আভাস, ঝিল্লীর কণ্ঠে ফুটল ভাষা, আকুল হয়ে উঠল বনমর্মর।

চাঁদ উঠল। চিরকাল যেমন ওঠে।

৭

সি. আই. ডি. দারোগা আবার এলেন।

আর বোধ হয় আপনাকে বাঁচাতে পারলাম না মশাই।

অংশুমান রোজ যেমন থাকে, আজও তেমনই চুপ ক'রে রইল।

আপনি চুপ ক'রে আছেন, কিন্তু আর কেউ চুপ ক'রে নেই। সবাই আপনার নাম বলছে।

আড়চোখে চাইলেন একবার অংশুমানের দিকে, তার পর পানের ডিবে বার ক'রে চার-পাঁচ খিলি পান কুপকুপ ক'রে খেয়ে ফেললেন।

আসুন।

আমি তো খাই না জানেন।

আরে, নিন না মশাই, এক খিলি খেয়েই দেখুন না। চমৎকার মিঠে পান, খাসা লাগবে। নিন, লোকে অনুরোধে ঢেঁকি গেলে, আপনি এক খিলি পান খেতে পারছেন না?

অংশুমান চুপ ক'রে রইল।

আচ্ছা, পান না নিলেন, আসল কথাটা ব'লে ফেলুন দিকি। আমার কথাটা শুনুন, যা জানেন ব'লে ফেলুন সব। ব'লে ফেলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ ঢেকে রাখতে পারবেন না তো কিছু।

আপনার বন্ধুরাই ব'লে দেবে সব। দিচ্ছেও। ধরাও পড়েছে অনেকে।

অংশুমান নীরব।

বলবেন না কিছু?

বলেছি তো, আমি কিচ্ছু জানি না।

দারোগা সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবার একটু।

আপনি মনে করছেন, আপনি খুব দেশের কাজ করছেন। কিন্তু এর ফলে কি হবে জানেন? দেশই আপনার উচ্ছন্ন যাবে। গভর্মেণ্টের সঙ্গে বেশি চালাকি চলে না। রেল-লাইন উপড়ে, টেলিগ্রাফের তার কেটে, পোস্ট-আপিস পুড়িয়ে কতক্ষণ জব্দ করবেন আপনি গভর্মেণ্টকে, যখন তাদের হাতে হাজার হাজার এরোপ্লেন আর বোমা রয়েছে? মেরে ধুনে দেবে সব। অতও করতে হবে না, চাবুকের চোটেই সিধে হয়ে যাবে। প্রতি গ্রাম থেকে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় হচ্ছে, গোরা সোলজার দেখেই পেচ্ছাপ ক'রে ফেলছে অধিকাংশ লোক, আপামরভদ্র হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ছে ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের পায়ের তলায়। তার পর কনট্রোলের যে রকম ব্যবস্থা হচ্ছে শুনলাম, তাতে একটি লোক খেতে পাবে না, পরতে পাবে না, প্রয়োজনীয় কোন জিনিস পাবে না আর। এক মুঠো চালের জন্যে, এক টুকরো কাপড়ের জন্যে হন্যে কুকুরের মত ঘুরে বেড়াতে হবে সবাইকে এই গভর্মেণ্টেরই দ্বারে দ্বারে। আর এসব কেন হবে, জানেন? আপনাদের মত ত্যাঁদড় লোকেদের একগুঁয়েমির জন্যে। আপনাদের কি ক'রে শায়েস্তা করতে হয় তা গভর্মেণ্ট জানে, মাঝ থেকে কতকগুলো নিরীহ লোক মারা যাবে।

উঠে গিয়ে একবার পিক ফেললেন। তার পর অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বললেন, তার চেয়ে ব'লে ফেলুন যে, হীট অব দি মোমেণ্টে ক'রে

ফেলেছিলাম, মাথার ঠিক ছিল না, আমরা সামলে-সুমলে নেব সব। ছাড়া পেয়ে যাবেন। সদ্‌বুদ্ধিটা নিন দয়া ক'রে।

আর এক খিলি পান খেলেন।

অংশুমান নীরব।

যা জানেন, অকপটে ব'লে ফেলুন সব। কেন কচলাচ্ছেন মিছে?

আমি কিচ্ছু জানি না।

আচ্ছা লোক আপনি মশায়! ধন্য! ঢের ঢের লোক দেখেছি, কিন্তু আপনার মত এমনটি আর দেখি নি। মিছিমিছি কত লোককে কষ্ট দিচ্ছেন বলুন তো! আপনার বুড়ো বাবাকে পর্যন্ত ধ'রে নিয়ে গেছে, জানেন? মারধোর পর্যন্ত করছে নাকি।

অংশুমান চমকে উঠল।

বাবাকে ধরবার মানে?

মানে আপনিই।

আর একটু থেমে হেসে বললেন, আর আপনিই এর প্রতিকার করতে পারেন। সত্যি কথাটা বলতে দোষ কি?

অংশুমান নীরব। বাবার শীর্ণ মুখখানা চোখের উপর ভাসছিল তার। সত্যিই নিরীহ লোক। সারাজীবন কেরানীগিরি ক'রে সসঙ্কোচে কাটিয়েছেন। চারটে মেয়ের বিয়ে দিতে আর অংশুমানকে পড়াতেই যথাসর্বস্ব গেছে। ধার হয়েছে কিছু। আশা ছিল, অংশুমান এম. এস-সি. পাস ক'রে সংসারের দুঃখ ঘোচাবে। এম. এস-সি. সে পাস করেছে। কিন্তু সংসারের দুঃখ ঘুচল কি?

কি ঠিক করলেন?

বলেছি তো, আমি কিছু জানি না।

উঃ, সাংঘাতিক লোক আপনি! ডেন্‌জারাস। নিজেই কষ্ট

পাবেন। আচ্ছা, এখন উঠি তবে। আবার আসব। সহজে হাল ছাড়বার লোক আমি নই। ভেবে দেখুন, ভেবে দেখুন, ভাল ক'রে ভেবে দেখুন। সংসারটাকে এমন ক'রে ডুবিয়ে দেবেন না, বুঝলেন, ভেবে দেখুন।

চ'লে গেলেন।

নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল অংশুমান।

৮

কখনও ফুলের উপর বসছে, কখনও পাতার উপর, কখনও বেড়ার শুকনো কঞ্চির ডগায়। ব'সেই উড়ছে আবার। চঞ্চল একদল প্রজাপতি। এক মুহূর্ত স্থির নয়, পাগলের মত উড়ে বেড়াচ্ছে খালি। নানা রঙের। সূর্যালোকের রঙগুলো হঠাৎ যেন স্বাতন্ত্র্য-লাভ করেছে এই নির্জন প্রান্তরে। স্পর্শ ক'রে বেড়াচ্ছে সব কিছু মনের আনন্দে। শিয়ালকাঁটার কণ্টকপল্লবকে মহিমান্বিত ক'রে সোনার বরণ যে ফুলগুলি ফুটেছে, তারা যেন উপভোগ করছে খামখেয়ালী প্রজাপতিদের এই হুড়োহুড়ি। অপরূপ হাসি ফুটেছে তাদের মুখে। কুহু-কুহু কুহু-কুহু কলকণ্ঠে বাহবা দিয়ে উঠল যেন কোকিলটা। বসছে উড়ছে, বসছে উড়ছে—বিরাম নেই, ক্লান্তি নেই। বিচিত্রপক্ষ কতকগুলো খেয়াল মাতামাতি ক রে বেড়াচ্ছে দুপুরের রোদে।...

চিরকালই করে।

৯

অন্ধকার।

অসংখ্য ক্ষুধিত পীড়িত অশিক্ষিত স্বার্থপর ধূর্ত মিথ্যাচারী

বিশ্বাসঘাতক বিলাস-লোলুপ কামনা-ক্লিষ্ট আতুর জনতা···হিমালয় থেকে কুমারিকা, গুজরাট থেকে আসাম···কোথাও বাদ নেই। অথচ সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই দেশ, রামায়ণ মহাভারত জাতক গীতা এই দেশেরই কাব্য, মহত্বই এ দেশের মেরুদণ্ড, পরার্থপরতাই জীবন-মন্ত্র। সেই দেশের এ কি দুর্দশা! আকাশচারী বিহঙ্গম আফিঙের নেশায় অভিভূত, পিঞ্জর-বন্দনা করছে মধুরকণ্ঠে। নাদির-শাহ তৈমুরলঙ্গ বহু ভারতবাসীকে হত্যা করেছিল, বহু বিদেশী দস্যু বহুবার লুণ্ঠন ক'রে গেছে ভারতকে, কিন্তু এমন নিঃস্ব আমরা কখনও হই নি। আজ আমাদের মনুষ্যত্ব নেই, আদর্শ লাঞ্ছিত, বিবেক মোহ-গ্রস্ত। যে পদাঘাতে আমাদের সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে, সেই পদই লেহন ক'রে চলেছি সগৌরবে। ওই দারোগাটাও আমাদের দেশের লোক।···

উত্তপ্ত মস্তিষ্কে উঠে বসল অংশুমান। মনে হ'ল, যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে। বাবার মুখটা মনে পড়ল আবার। মারধোর করছে? ওই নিরীহ বৃদ্ধকে মারতে হাত উঠছে কার? আমাদেরই দেশের লোকের, আবার কার? পাঞ্জাবে জালিয়ানবালাবাগ হয়েছিল, কিন্তু পাঞ্জাবীরাই সবচেয়ে বেশি রাজভক্ত। বাংলা দেশ শ্মশান হয়ে গেল, কিন্তু বাঙালীরাই গোয়েন্দাগিরিতে আজও সবচেয়ে বেশি দক্ষ। ঘরে ঘরে বিশ্বাসঘাতক, কাউকে বিশ্বাস নেই। না, কাউকে না। কিন্তু সত্যি কি কোনও উপায় নেই? আছে, নিশ্চয় আছে। কোথায় ত্রাণকর্তা, কোথায় তুমি?—আর্তনাদ ক'রে উঠল অংশুমান।

ধীরে ধীরে কারা-প্রাচীরে মূর্ত হয়ে উঠল এক অশ্বারোহী মূর্তি; কৃপাণধারী দিব্যকান্তি পুরুষ। অশ্বটি বড় জীর্ণশীর্ণ। কৃপাণটিও মরচে-ধরা। প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে তিনি চেয়ে রইলেন অংশুমানের দিকে।

প্রত্যাশাভরা প্রদীপ্ত দৃষ্টি। অংশুমানের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল সে। মুখে ভাষা ফুটল অনেকক্ষণ পরে।

আপনি কে?

আমি? চিনতে পারছ না?

অংশুমান চেনবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। অথচ অচেনাও নয়, কোথায় যেন···

তোমাদেরই সৃষ্টি আমি। যুগে যুগে তোমরাই সৃষ্টি করেছ আমাকে নানা রূপে। তোমাদের সৃজনীশক্তির মধ্যেই আমার অস্তিত্ব অমরত্ব লাভ করেছে কূর্ম মৎস্য বরাহ অবতারে। নৃসিংহরূপে আমিই হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস করেছি, বলির গর্ব আমিই চূর্ণ করেছি একদিন, অত্যাচারী ক্ষত্রিয়কুলকে আমারই পরশু নির্মূল করেছিল, দশমুণ্ড রাবণকে আমিই সংহার করেছি একদা, কুরুক্ষেত্র প্রকম্পিত হয়েছিল একদা আমারই পাঞ্চজন্য-নির্ঘোষে, কংস-জরাসন্ধকে আমিই বধ করেছি, আবার অহিংসার বাণী আমিই প্রচার করেছি বুদ্ধরূপে। আমারই চিরন্তন আশ্বাসবাণী মূর্ত হয়েছে তোমাদের কবির রচনায়।—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

কিন্তু তোমাদের পুরুষকারই আমাকে সম্ভব করে। আমি আজও তোমাদের কাছে কল্পনামাত্র, তাই আমার অশ্ব জীর্ণশীর্ণ, কৃপাণ তীক্ষ্ণতাহীন।

অংশুমান সবিস্ময়ে চেয়ে রইল অশ্বটির দিকে। সত্যিই বড় রুগ্ন। তার মনের কথা টের পেয়ে সেই দিব্যকান্তি পুরুষ আবার বললেন, আমার অশ্ব রুগ্ন নয়, ক্ষুধিত। সামান্য ভূমির শস্যে এর পুষ্টি হয় না।

কোন্ ভূমির শস্য চাই তা হ'লে?

তাজা প্রাণের রক্ত যে ভূমিতে সার সিঞ্চন করেছে, সেই ভূমির শস্য চাই এই দেবদত্ত অশ্বকে সঞ্জীবিত রাখার জন্যে। বিদেশীর চর্বিত নানা ইজ্‌ম্ গলাধঃকরণ ক'রে যে পুরীষ তোমরা সৃষ্টি করছ, তাও একপ্রকার সার বটে, কিন্তু সে সারে উৎপন্ন ফসল আমার অশ্ব স্পর্শ করে না, তাই সে দুর্বল। আমার কৃপাণও তাই অতীক্ষ্ণ। ধৈর্যের কঠিন প্রস্তরে সবল হস্তে শান দিয়ে আমার হস্তে এ কৃপাণ তুলে দেবে যে, কোথায় সেই বীরপুরুষ? তাকেই অন্বেষণ করছি। তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি কারা থেকে কারান্তরে। আমি জানি, কারাপ্রাচীরের অন্তরালেই তার তপস্যা,...বন্দিনী জননীর কোলে আমিও জন্মলাভ করেছিলাম একদিন এই কারাগারেই।

বলুন, কে আপনি?

আমি তোমাদের অসমাপ্ত কল্কি অবতারের কল্পনা।—মিলিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে।

আবার অন্ধকার।...

তোমাদেরই পুরুষকার আমাকে সম্ভব করে—ধীরে ধীরে এই কথাগুলো মূর্ত হয়ে সকৌতুকে চেয়ে রইল যেন তার দিকে। কি রকম পুরুষকার চাই? জ্ঞান হয়ে থেকে একদিনও তো অলস হয়ে ব'সে থাকে নি সে। ভাল হব, বড় হব, দেশকে ভাল করব, বড় করব—এই সাধনাই তো করছে অহরহ। তবু কিছু হবে না?

হবেই। নিশ্চয় হবে। সমস্ত জীবনকে ইন্ধন করেছ, আগুন জ্বলবে না, তা কি হতে পারে কখনও? জ্বলবেই।

সবিস্ময়ে অংশুমান চেয়ে রইল। নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারছে না। স্বয়ং বিবেকানন্দ সামনে দাঁড়িয়ে।

এক টুকরো চকমকির মধ্যেও আগুন প্রচ্ছন্ন থাকে; আঘাত

করলেই তা ছিটকে বেরিয়ে আসে। আঘাত কর, আঘাত কর, ক্রমাগত আঘাত ক'রে যাও, ব্যর্থতায় হতাশ হ'য়ো না।

সহসা অন্তর্ধান করলেন।

অন্ধকার হয়ে গেল আবার।

অংশুমানের সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। মনে হ'ল, বিবেকানন্দের এই বাণী নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পথে পথে প্রচার করা উচিত তারস্বরে "আঘাত কর, আঘাত কর, ক্রমাগত আঘাত ক'রে যাও, ব্যর্থতায় হতাশ হ'য়ো না।"

সহসা উঠে ছুটে বেরিয়ে যেতে গেল সে, বন্ধ দরজায় প্রত্যাহত হয়ে নতুন ক'রে আবার মনে পড়ল যে, সে বন্দী। বন্দী! তা হ'লে? মনের মধ্যে যত কথা জ'মে উঠেছে, তা কি কোনদিন বলা হবে না কাউকে? এই চারটে দেওয়'লের মাঝখানে তা চাপা থেকে যাবে চিরকাল? সমস্ত ছাপিয়ে এই দুঃখটাই তার মনে বড় হয়ে উঠল, চাপা থেকে যাবে সব? যা ভাবলাম, যা দেখলাম, যা শুনলাম, তা বাইরে আর প্রকাশ করতে পারব না হয়তো জীবনে। বাইরের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে চিরকালের মত।

"একটা কথা শুনলে বোধ হয় আশ্বস্ত হবে—যোগসূত্র কখনও ছিন্ন হয় না, ছিন্ন করা যায় না। আমরাই প্রথমে এর আভাস পেয়ে প্রমাণ করেছিলাম। তার পর আরও অনেকে করেছেন পরে আরও ভালভাবে।"

অংশুমান দেখলে, সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন। সকলেরই ছবি দেখেছিল, সকলকেই চিনতে পারল সে। ওয়াটসন, সাল্‌ভা, সোমেরিং, স্টিন্‌হীল, মর্স, লিণ্ড্‌সে, হাইটন···। সবাই স্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তার দিকে।

"আগে সকলের ধারণা ছিল যে, তার না থাকলে বুঝি বিদ্যুৎ এক

জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে না। আমরা কিন্তু হাতে কলমে প্রমাণ করেছিলাম যে, মাটি এবং জলও বিদ্যুৎতরঙ্গ বহন করতে পারে। এরই জোরে টেলিগ্রাফ তৈরি করেছিলাম আমরা সেকালে। সফলও যে হয়েছিলাম, তা তো পড়েছ। তারের অভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহের গতি যেমন আটকায় না, প্রচার করবার মত সত্যি যদি কোনও জোরালো বাণী থাকে তোমার, জেলের দেওয়ালও তা আটকাতে পারবে না। অদ্ভুত উপায়ে অদৃশ্য পথে তা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মনে গিয়ে পৌঁছবেই।”

একটু হেসে ওয়াট্‌সন চ'লে গেলেন। যাবার সময় হাইটনকে কনুই দিয়ে একটা ধাক্কা মেরে গেলেন। ভাবটা—তোমার বক্তব্যটা এইবার ব'লে ফেল। হাইটন এগিয়ে এসে একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন, যখন অক্ষর সৃষ্টি হয় নি, তখনও মানুষ জ্ঞানের চর্চা করত। তাদের জ্ঞানের ধারা কি অবলুপ্ত হয়েছে? তোমাদের বেদ উপনিষদ বেঁচে রইল কি ক'রে?

সাল্‌ভা বললেন, অন্তরা তোমার মনের কথা টের পেয়েছিল কি ক'রে? মুখ ফুটে তাকে বল নি তো কোনদিন কিছু!

পেয়েছিল নাকি?—মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল অংশুমানের।

সমস্বরে হেসে উঠলেন সবাই। তার পর চ'লে গেলেন সবাই একযোগে।

অন্ধকার···

বিনা-তারে বার্তা-বহনের আকাঙ্ক্ষা বৈজ্ঞানিকের মনে জেগেছিল তারের অযোগ্যতা দেখে। মানুষ দ্রুত সুনিশ্চিতভাবে বার্তা পাঠাতে চায়, অব্যাহত হবে তার গতি ··তারের সে ক্ষমতা ছিল না।

মনে ছবির পর ছবি ফুটতে লাগল।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর। রাত্রিকাল। মর্স নদীর ভিতর এক মাইল লম্বা মোটা একটা ইন্‌স্যুলেটেড তার ফেলেছেন এই প্রমাণ করবার জন্যে যে, জলের ভিতরও তারযোগে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত করা সম্ভব। রাত্রে তারটা জলে ফেলে এলেন, সকালে দেখাবেন সকলকে। পরদিন বিরাট জনতা সমবেত হয়েছে নদীর ধারে মর্সের এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট দেখবার জন্যে। জলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎতরঙ্গ আসবে! রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই। বিদ্যুৎতরঙ্গ একবার একটু এল, তার পর আর এল না। অনেক চেষ্টা করলেন মর্স, কিন্তু আর সাড়া পাওয়া গেল না। হো-হো ক'রে হেসে উঠল সবাই। যত সব আজগুবি কাণ্ড! এই পাগলাটার পাল্লায় প'ড়ে সমস্ত সকালটাই মাটি। ঠাট্টায় বিদ্রূপে হাসিতে কলরবে পূর্ণ হয়ে উঠল চতুর্দিক। মুখ কালো ক'রে ব'সে রইলেন মর্স যন্ত্রটার দিকে চেয়ে। কি হ'ল? এল না কেন? হৈ-হৈ করতে করতে জনতা ছত্রভঙ্গ হ'ল। মর্স বেরুলেন কারণ অনুসন্ধান করতে। কারণ পাওয়া গেল কিছুদূর গিয়েই। একটা নৌকো নঙ্গর তোলবার সময় তারটাকে টেনে তুলেছিল, তারপর সেটার আদি-অন্ত না পেয়ে তা থেকে প্রায় দুশো ফিট কেটে নিয়ে স'রে পড়েছিল। মর্স ভাবলেন, এত বড় লম্বা তার জলের তলায় রাখলে এ রকম নানা দুর্ঘটনা অহরহই ঘটবে। তার সুতরাং চলবে না। জলকেই করতে হবে বৈদ্যুতিক বাণীর বাহক। মর্সের জীবন-কাহিনী মনে পড়ল অংশুমানের। কিছুতেই নিরস্ত হন নি। প্রথম জীবনে হতে চেয়েছিলেন চিত্রকর। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-সাদে-ল্যাম্বের বন্ধু বিখ্যাত মার্কিন চিত্রশিল্পী অ্যাল্‌স্টনের শিষ্য ছিলেন তিনি। 'ডেথ অব হার্‌কিউলিস' ছবিখানা এঁকে নামও হয়েছিল। কিন্তু পেট ভরল না

তাতে। 'দি জাজ্‌মেণ্ট অব জুপিটার' ছবিখানার ক্রেতাই জোটে নি এক বছর। সক্রিয় মন অলস হয়ে ব'সে থাকে নি। বিজ্ঞানচর্চায় মেতে উঠলেন। নূতন ধরনের পাম্প ক'রে ফেললেন একটা, মিনিটে ৩৬০ গ্যালন জল তুলতে পারে। পেটেণ্ট করলেন সেটা। পেট ভরল। তার পর আকৃষ্ট হলেন ইলেকট্রিসিটির দিকে। অবাক হয়ে গেলেন এর বিচিত্র সম্ভাবনায়। একবার এক জাহাজে আসতে আসতে একজন আরোহীর মুখে শুনলেন যে, যত দূরই হোক না কেন, বিদ্যুৎতরঙ্গ এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিমেষেই নীত হয়, তখনই তাঁর মনে হ'ল, তা হ'লে এই তরঙ্গযোগে নিমেষের মধ্যে খবরই বা পাঠানো যাবে না কেন? সাঙ্কেতিক শব্দ সৃষ্টি করলেই যাবে। জাহাজেই তাঁর মাথায় এল ডট্ আর ড্যাশের কথা।...মর্সের টেলিগ্রাফিক কোড আজ বিশ্ববিখ্যাত। যিনি বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর হতে পারতেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তাঁকে হতে হ'ল বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। মানুষ যা হতে চায়, তা হতে পারে না। অংশুমান আশ্বস্ত হ'ল যেন একটু। মনের মধ্যে একটা সংশয় কাঁটার মত খচখচ করছিল। বারম্বার মনে হচ্ছিল, সামান্য কেরানীর ছেলে আমি, আমার কি উচিত ছিল না লেখাপড়া শেষ ক'রে সংসারের ভার নেওয়া? বাবার বুকের-রক্ত-জল-করা পয়সায় লেখাপড়া শিখেছি, কি প্রতিদান দিলাম তাঁকে? পুলিসের হাতে মার খাচ্ছেন আমার জন্যে?...পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ?...হঠাৎ মর্সের মুখখানা ফুটে উঠল চোখের সামনে। মুখময় বলি-রেখা, অধরে বিষণ্ণ হাসি।

হ্যাঁ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ। গাছের ফল যখন স্বপ্ন দেখে যে আকাশে উড়ে যাব, তখন মাধ্যাকর্ষণের কথাটা সে ভুলে যায়। এ ছাড়া তোমার অন্য গতি ছিল না।

মিলিয়ে গেল মুখখানা।

অংশুমানের মনে প্রশ্ন জাগছিল একটা। মাধ্যাকর্ষণের টানে যে ফল মাটিতে নেবে আসে, তার ভবিষ্যৎ সার্থক হয় ওই মাটিতেই অঙ্কুরিত বীজের নব নব উন্মেষে। আমার এই অসমসাহসিকতার কি ভবিষ্যৎ আছে কোনও? এই স্বেচ্ছাবৃত কৃচ্ছ্রসাধন···। আবার ছবি ফুটে উঠল একটা। পিঠে কাপড়ের বোঝা, হাতে বই—চলেছে বালক লিণ্ডসে। গরিব চাষার ছেলে, তাঁতীর কাজ শিখছে। তাঁত বোনা শেখে, কাপড়ের বোঝা পিঠে ক'রে দোকানে দিয়ে আসে। স্কুলে যাবার সঙ্গতি নেই। অধ্যয়নস্পৃহা কিন্তু প্রবল। পিঠে কাপড়ের বোঝা নিয়ে পথ চলতে চলতে বই পড়ছে···গ্রাম্য মেঠো পথ বেয়ে তন্ময় হয়ে চলেছে লিণ্ডসে। কিছুতেই দমবে না। ছুটিতে কাজ ক'রে ট্যুশনি ক'রে কত কষ্টে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলে বাইশ বছর বয়সে। শেষ করলে আর্ট কোর্স, তার পর থিয়োলজি পড়লে, তার পর বিজ্ঞান। কখনও থামে নি, দ্বিধাগ্রস্ত হয় নি···

লিণ্ডসে সশরীরে এসে সামনে দাঁড়ালেন। চোখ-মুখ দেখে মনে হয় না যে, অতবড় বিদ্বান। সর্বদাই যেন ভীত সঙ্কুচিত হয়ে আছেন, যেন কিছু জানেন না। কথা বলতেও ইতস্তত করছেন, পাছে বেফাঁস কিছু ব'লে ফেলেন—এই ভয়। অংশুমানের দিকে চকিতে একবার চেয়ে দেখলেন, ঘন ঘন চোখের পাতা পড়ল কয়েকবার, তার পর একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, তোমার মত আমিও একদিন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলাম। দ্বিধা নয়, ত্রিধাই বলতে পার। ইলেক্‌ট্রিসিটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখলাম যে, এর তিনটে সম্ভাবনা আছে। প্রথম, এর শক্তি দিয়ে নানারকম কাজ করানো সম্ভব—এ চাকা ঘোরাতে পারে, ভারী জিনিস তুলতে পারে। দ্বিতীয়, সংবাদ বহন

করতে পারে। তৃতীয়, আলো দিতে পারে। আমি কোন্‌টা নিয়ে গবেষণা শুরু করব, তা ঠিক করতে পারি নি প্রথমে। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে ঠিক করলাম—আলো। যে আলো হাওয়ায় নিববে না, ঝড়ে কাঁপবে না, তারই সন্ধান করতে হবে সকলের আগে। কেন আমার এ ইচ্ছে হয়েছিল জানি না। আলোক-প্রবণতা বোধ হয় মানব-মনের আদিমতম এবং আধুনিকতম বৈশিষ্ট্য···

চুপ করলেন কয়েক মুহূর্ত, চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একটু।

ডাণ্ডি জেলের কয়েদীদের পড়াতাম। অনেক কাল পড়িয়েছি। সেখানেও দেখেছি, মানুষের মন আলোর সন্ধান করছে কেবল। আমার একটি ছাত্র বেশ কৃতী হয়েছিল। তারও ঝোঁক হ'ল আলোর দিকে। জ্যোতিষ্ক-বিদ্যায়। অন্ধকার জেলে বছরের পর বছর কাটিয়েছে যে, সে তন্ময় হয়ে গেল আকাশের সূর্যতারার স্বপ্নে। তুমিও বোধ হয় আলোর স্বপ্ন দেখছ।—এই ব'লে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলেন লিণ্ড্‌সে।

আলো!

লক্ষ কোটি সূর্য-তারকা-বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরিত এক মহাকাশ ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে উঠল অংশুমানের মানসদৃষ্টির সম্মুখে।

"আলোর অর্থ অন্ধকারও হতে পারে। অত্যুগ্র-আলোক-বিভ্রান্ত যে মন অন্ধকার-কামনায় আলো নিবিয়ে দিতে চাইছে, সেও এক হিসাবে আলোরই উপাসক। আলো মানে বিদ্রোহ···। প্রকাণ্ড পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমি যখন ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎকে পৃথিবীর বিদ্যুতের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করছিলাম, তখন আসলে আমি দূরত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছিলাম। মানুষ বিদ্রোহী জীব···সে ওলটাতে চায় এবং ওলটাতে পারে।"

লুমিস এসে এই কথাগুলি ব'লে দাঁড়িয়ে রইলেন উদ্ধত ভঙ্গীতে একটা প্রত্যুত্তরের আশায়। অংশুমান কিছু বলবার পূর্বেই আবার বললেন, তুমিও পারবে। চিয়ার আপ।—ব'লেই মিলিয়ে গেলেন।

১০

কমরেড মীনা দত্ত

স্থচরিতাস্থ,

ভাই মীমু, এতদিন আমার চিঠি না পেয়ে আশ্চর্য হয়েছ হয়তো। অনেক আগেই আমার উত্তব দেওয়া উচিত ছিল, সময় ক'রে উঠতে পারি নি। ঘণ্টা মিনিট যে সময়ের মাপকাঠি সে সময় আমার প্রচুব ছিল, আমি ডেপুটি-গৃহিণী, ছেলে-পিলে হয় নি, চাকর-বামুন আছে, স্বামী টুবে টুরে বেডান, স্থতবাং সময় বলতে সাধারণত যা বোঝায়, তা আমার যথেষ্ট। সময় ছিল না মনেব, যে মন তোমার চিঠির জবাব দেবে। আগস্ট-ডিস্টাববেন্সেব তুমুল তুফানে সমস্ত মন এমন বিপর্যস্ত হয়েছিল যে, চুল বাঁধবার অবসর পর্যন্ত ছিল না। অথচ আমি প্রত্যক্ষভাবে ওতে যোগ দিই নি। ডেপুটি-গৃহিণীব ওসবে যোগ দেবার উপায় নেই। আমাদের প্রতিবেশী অংশুমানবাবুর সঙ্গে ভাসা-ভাসা আলাপ করেছি খালি সংযত ভাষায, কিন্তু পরোক্ষলোকে আমার মন অলস হয়ে ব'সে থাকে নি। সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করছিল, ওই অংশুমানবাবুরই কার্যকলাপ। মুগ্ধ হয়ে গেছি তার বীরত্ব দেখে, মনে মনে প্রণাম করেছি তাকে শতবার। এখন সে জেলে। সুতরাং তোমার চিঠির জবাব দেবার অবসর হয়েছে। অবসর পেলেও এর আগে এমন ক'রে জবাব দিতে পারতাম না, কারণ জবাবটা নিজের

কাছে এখন যতটা স্পষ্ট হয়েছে, আগে ততটা ছিল না। সুতরাং আশা করছি, তোমাকে বোঝাতে পারব।

তোমাদের দলে যতদিন ছিলাম, ততদিন বুঝি নি, এখন কিন্তু ভাল ক'রে বুঝতে পারছি যে, আমার অন্তত কমিউনিস্ট হওয়ার প্রেরণা ছিল দেশ-প্রেম নয়, আত্ম-প্রেম। ক্যাপিটালিস্টদের ধ্বংস করার যে মুখস্থ বুলি আওড়াতাম, তা পরশ্রীকাতরতার তাড়নায়, প্রোলিটারিয়েটদের প্রতি বেদনা-বোধের তীব্রতায় নয়। 'মাদার রাশিয়া'তে যেসব আত্মত্যাগী যুবক-যুবতী কিশোর-কিশোরীর কথা পড়েছি, আমাদের মধ্যে তাদের মত যারা আছে (আছে নিশ্চয়ই, যদিও আমার চোখে পড়ে নি), তারা কই আমাদের দলে যোগ দেয় নি তো! আমার বিশ্বাস, আজকাল এই যে দলে দলে ছেলে-মেয়েরা, বিশেষ ক'রে মেয়েরা, কমিউনিস্ট হচ্ছে, ওটা ফ্যাশানের খাতিরে, কমিউনিজ্‌মের প্রতি শ্রদ্ধাবশত ততটা নয়। এটা বর্তমান যুগের সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার একটা অনিবার্য ফল বলতে পার। আমাদের ঘরে ঘরে ছেলেরা বেকার, মেয়েরা অবিবাহিতা। অথচ তারা বুলি কপচাতে শিখেছে। প্রকৃত শিক্ষা আমরা পাই না। আমরা ডিগ্রী লাভ ক'রেই কুলীন। আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির তোয়াক্কা রাখি না। উদর-সর্বস্ব স্বার্থপর বণিক-সভ্যতার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে আমরা তাদের কাছে আত্মবিক্রয় ক'রে যে পাঠ নিয়েছি, তার মূলমন্ত্র স্বার্থপরতা। আমাদের ঘরে ঘরে বেকার ছেলে আর অবিবাহিতা মেয়ের দল এই শিক্ষা পেয়ে অসন্তুষ্টির তুষানলে দগ্ধ হচ্ছিল এতদিন। কারণ এই শিক্ষার ফলে বেচারাদের লোভ উদ্দীপ্ত হয়েছে ষোল আনা, অথচ তা চরিতার্থ করবার কোন উপায় নেই। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গুণে ছেলেরা উপার্জন করতে পারে না, সমাজ-ব্যবস্থার গুণে মেয়েদের বর জোটে না। দুস্তর

বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে তবু যেসব ছেলে উপার্জন করতে পেরেছে বা যেসব মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তাদের সৌভাগ্যে মনে মনে ঈর্ষান্বিত হওয়া ছাড়া অধিকাংশ বঞ্চিতদের অন্য কোন উপায় ছিল না এতদিন। বিদ্রোহী রাশিয়ার অসমস্ত দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে এখন তারা সেই পরশ্রীকাতরতার গায়ে লেনিন-স্টালিনের বড় বড় নাম জুড়ে দিয়েছে। জোর-গলায় ব'লে বেড়াচ্ছে, যাদের তোমরা এতদিন বড়লোক ব'লে এসেছ, আমরা ধ'রে ফেলেছি, আসলে তারা ছোটলোক, তারা পুঁজিবাদী, এই দেখ কার্ল মার্ক্স্…

যে পরশ্রীকাতরতাটা প্রকাশ করতে আগে লোকে লজ্জিত হ'ত, একটা বড নামের মুখোশ প'রে তাই ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রচার করাটা গৌরবজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। কিন্তু ভেবে দেখ, ধনীমাত্রেই পাজি, শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই জুয়াচোর—এই নীতি প্রচার করা অন্য যে-কোন দেশের পক্ষে শোভন হোক, ভারতবর্ষের পক্ষে নয়। যে হিন্দুধর্ম ভারতবর্ষের গৌরব, পরমতসহিষ্ণুতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা যে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য, সেই ভারতবর্ষের ধনীমাত্রেই পাজি—এই মত প্রচার করতে যাওয়া কি লজ্জাকর! একটু যদি ভাল ক'রে ভেবে দেখ, হিন্দুধর্মই প্রকৃত স্বাধীনতার ধর্ম। প্রকৃত সাম্যবোধ আত্মানুসন্ধী হিন্দুধর্মেই আছে, অন্য কোন ধর্মে নেই, কারণ সাম্যবোধ জিনিসটা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক পশু-জগতে ওর স্থান নেই। হিন্দুধর্মই একমাত্র ধর্ম, যে প্রত্যেক নরনারীর ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক প্রেরণাকে শ্রদ্ধা করেছে, বেয়নেট উঁচিয়ে বলে নি—তুমি এই ইজ্‌মে বিশ্বাস করবে কি না, যদি না কর, তা হ'লে তোমার বাঁচবার অধিকার নেই। এই সাম্যবোধই হিন্দু-ভারতবর্ষকে আধিভৌতিক জগতে দুর্বল করেছে হয়তো, সে নির্বিচারে ভিন্নধর্মাবলম্বীকে হত্যা করতে পারে নি ব'লেই

এ দেশে এত ধর্ম-বৈচিত্র্য, এত মতানৈক্য। ভারতবর্ষের তথাকথিত রাজনৈতিক একতা নেই, কারণ ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বহুর মধ্যে একক প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করেছে, এবং তা করতে গিয়ে আধিভৌতিক জগতে জাতিহিসাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, কারণ আধিভৌতিক জগৎটা পশুর জগৎ। মানুষ যেখানে পশু, সেখানেই সে আধিভৌতিক জগতে বিচরণ করে, দেহের ক্ষুধা পাশবিক বাসনা মেটাবার জন্যে মারামারি কাটাকাটি করে, সাম্য-অসাম্য নিয়ে মাথা ঘামায় না, প্রয়োজনের তাগিদে শক্তির শরণাপন্ন হয়, কেড়ে খায়, দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করে। তুমি হয়তো বলবে, আধিভৌতিক জগৎটাও তো আছে, ওটাকে তো অস্বীকার করলে চলবে না, বহু লোক দারিদ্র্যের চাপে ম'রে যাবে, আর জনকতক ঐশ্বর্য ভোগ করবে—এ রকম সমাজব্যবস্থাই কি ভাল? কে বলছে, ভাল? আধিভৌতিক জগৎটা যে আছে, তা তো প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছি, অস্বীকার করব কি ক'রে? আমার আপত্তি ভণ্ডামিতে। ক্ষুধার আঁহার, কামনার ইন্ধন সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছি যখন, তখন আবার সাম্যের মুখোশ কেন? বিদ্যুতালোকিত সুসজ্জিত ঘরে ফ্যানের তলায় ব'সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কিষাণদের দুঃখ, শ্রমিকদের কষ্ট নিয়ে অমুক দাদার সঙ্গে উত্তেজিত আলোচনার ছবিটা যে আধুনিক পরিবেশে দুষ্মন্ত-শকুন্তলারই সাবেক ছবি, তা অস্বীকার ক'রে যে ভণ্ডামিটাকে আমরা প্রশ্রয় দিয়েছি, তাতেই আমার আপত্তি। মাছের লোভে ছিপ ঘাড়ে ক'রে টোপ নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছি, ওর মধ্যে আবার সাম্যের আস্ফালন কেন? দীনের দুঃখে সত্যিই যারা বিচলিত হয়, তারা অত স্বার্থপর হয় না, হতে পারে না। নিঃস্বার্থপর ত্যাগী কমিউনিস্ট যে নেই তা আমি বলছি না, অনেক আছে হয়তো, কিন্তু আমাদের দলটির যে ছবি দেখেছি

তা শ্রদ্ধেয় সাম্যবাদীর ছবি নয়। কমিউনিজ্‌ম্‌ জিনিসটা যে খারাপ, তাও আমার বক্তব্য নয়। সাময়িক প্রয়োজনে যুগে যুগে ওর উদ্ভব হয়েছে নানা রূপে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও রাজনৈতিক পরিবেশ অনুসারে ওর চেহারাও হয়েছে নানা রকম। বঙ্গদেশে গোপালদেবের আমলে কিংবা আরও পূর্বে যে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল তার পরবর্তী যুগেও যে দীর্ঘকালব্যাপী কৈবর্ত-বিদ্রোহ হয়েছিল, তা মূলত বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ান বিদ্রোহেরই পূর্বসংস্করণ। যা একটু তফাত তা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও রাজনৈতিক পরিবেশের বিভিন্নতার জন্য। কমিউনিজ্‌ম্‌ যে অতি আধুনিক অভূতপূর্ব একটা কিছু, তা মনে করবার কোনও কারণ নেই। মানবের ইতিহাসে এ জিনিস বার বার ঘটেছে ও ঘটবে। সুতরাং কেউ তোমাদের পার্টি পরিত্যাগ করলে বা তোমাদের কথায় সায় না দিলেই তোমরা যে তাকে প্রগতি-বিরোধী, সেকেলে, রিঅ্যাক্‌শনারি প্রভৃতি বিশেষণে লাঞ্ছিত কর, সেটা যুক্তি-সহ আচরণ নয়। তা ছাড়া আর একটা কথাও তোমরা ভুলে যাও, সেকেলে হতেই বা দোষ কি, যখন মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে একাল সেকালের চেয়ে এক পাও এগোয় নি।

আমাদের দেশের জনসাধারণের দুর্দশার সীমা নেই। সে দুর্দশা ঘোচাবার জন্যে যাঁরা জীবন পণ করেছেন, তাঁরা পূজনীয়; কিন্তু তোমাদের চেষ্টা, কি ক'রে তাঁদের খেলো করবে, কোন্‌ আধুনিক মুখস্থ-করা ফর্‌ম্যুলায় ফেলে তাঁদের কর্মপদ্ধতির দোষ বার করবে। স্বাধীনতা-অপহারক বিদেশী রাজাই আমাদের দুর্দশার আসল কারণ। সেই বিদেশী রাজা স্বদেশে বিদেশে আমাদের নামে রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে মিথ্যা কথা, তোমরাও তাতে সায় দিয়ে চলেছ ক্রমাগত। তোমরাও বলছ যে, হিন্দু-মুসলমান মিলন হচ্ছে না ব'লেই আমরা

স্বাধীনতা পাবার উপযুক্ত নই; তোমরাও বলছ যে, অখণ্ড ভারতকে স্বাধীনতা দিলে অন্যায় করা হবে, পাকিস্তানই এর একমাত্র সমাধান। তোমরাও বুঝতে চাইছ না যে, হিন্দু-মুসলমান কেন, ইচ্ছা করলে রাজশক্তি পিতা-পুত্র স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য ঘটিয়ে দিতে পারে অনুগ্রহ-নিগ্রহের মাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে। তোমরা 'ফুড ফ্রন্ট' ক'রে এদেশের পুঁজিবাদীদের নাস্তানাবুদ করেছ, কিন্তু আসল পুঁজিবাদীর রোমটি পর্যন্ত স্পর্শ কর নি। ভারতবর্ষে যে বিদ্রোহ করবার জন্যে তোমরা একদা উৎকণ্ঠিত ছিলে, সেই বিদ্রোহ যখন সত্যি সত্যি হ'ল, তখন তোমরা শুধু স'রেই দাঁড়ালে না, তার বিরুদ্ধাচরণও করতে লাগলে অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট অজুহাতে। কোন স্বাধীনতাকামী লোকই ফ্যাসিজ্‌মের সমর্থন করে না, কিন্তু তোমাদের অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট আচরণগুলো বড় বেশি রকম পরস্পরবিরোধী। কেউ যদি মনে প্রাণে জীবহত্যাবিরোধী বৈষ্ণব হতে চায়, তা হ'লে কেউ আপত্তি করবে না, অনেকে তাকে ভক্তিও করতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে যদি কসাইখানা নির্মাণে সাহায্য করে, তা হ'লে ব্যাপারটা সন্দেহজনক হয়ে ওঠে। তোমাদের গুরু স্টালিন স্বদেশপ্রীতির জন্য মানবপ্রীতি বিসর্জন দিতে ইতস্তত করেন নি—এক কথায় থার্ড ইণ্টারন্যাশনালের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন; কিন্তু তোমরা স্বদেশের বিদ্রোহ-প্রচেষ্টাকে বাধা দিলে বিদেশী ফ্যাসিজ্‌মকে ধ্বংস করবার অজুহাতে। এ তোমাদের কেমন গুরুভক্তি বুঝি না। সুতরাং সন্দেহ হয়, গুরুতর ভক্তি করবার মত কোনও দেবতার সন্ধান পেয়েছ হয়তো কাছে পিঠে। ফ্যাসিজ্‌ম্ ধ্বংস করাই যদি তোমাদের নীতি, তা হ'লে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের সম্পর্কে ইংরেজও কি কম ফ্যাসিস্ট? তোমরা বলবে, আমরা তো তার বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করছি। কিন্তু যার বিরুদ্ধে

ক্রমাগত যুদ্ধ করছ, সে-ই যখন তোমাদের পিঠ চাপড়াচ্ছে, তার নিজেরই বিরুদ্ধ প্রোপাগাণ্ডা ছাপাবার জন্যে প্রচুর কাগজ দিচ্ছে, তখন ব্যাপারটা একটু গোলমেলে ঠেকে। সামান্য বিরোধিতার জন্যে যারা গুলি চালিয়ে হাজার হাজার লোক মেরে ফেলতে ইতস্তত করে না, মেদিনীপুর চট্টগ্রাম উজাড় ক'রে দেয়, দেশের নেতাদের বিনাবিচারে আটকে রাখে বছরের পর বছর, তারা তোমাদের সম্পর্কে এমন মহৎ হয়ে উঠল কি ক'রে? হয়তো এ সমস্তরই উপযুক্ত জবাবদিহি তোমাদের কাছে আছে, হয়তো আমি যা বুঝেছি তা সমস্তই ভুল (আহা, তাই হোক,) হয়তো আমি এত কথা লিখতামও না, কিন্তু আমি কেন তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক আর রাখতে পারি নি, তা জানতে চেয়েছ ব'লেই অকপটে সমস্ত কথা খুলে বলতে হ'ল, তা না হ'লে এসব অপ্রিয় আলোচনা তোলবার ইচ্ছে ছিল না। কারণ আমি জানি, আলোচনা দ্বারা তোমাদের স্বপক্ষে আনতে পারব না। তোমরা তর্কপটু চীৎকারদক্ষ বিদ্বান লোক, তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভবই হবে না হয়তো। এর উত্তরে তুমি যে কড়া জবাব দেবে, তার প্রত্যুত্তর দেবার সামর্থ্য বা প্রবৃত্তিও আমার আর থাকবে না সম্ভবত। তবু এত কথা লিখলাম, কেবল নিজের আচরণের সঙ্গতি রক্ষার জন্য।

একটা কথা আমি বুঝেছি, কারও উদ্দেশ্য যদি মহৎ এবং আচরণ যদি অকপট হয়, তা হ'লে কেবল মতবিরোধের জন্য কেউ তাকে ঘৃণা করে না। ভণ্ডই ঘৃণ্য। বিয়ে করবার পর আত্ম-আবিষ্কার ক'রে আমি চমকে গেছি। সেজে-গুজে আমি যে তোমাদের পার্টিতে রোজ যেতাম, এতে আমার মা বাবা আত্মীয় স্বজন কেউ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরা আপত্তি করলে তাঁদের মুখের উপর কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিতে

আমারও আপত্তি ছিল না, দিয়েছিও কতবার, গুরুজনদের মুখের উপর কড়া জবাব দেওয়াটাই ছিল আমাদের বাহাদুরি। ঔদ্ধত্য যদিও কোন কারণেই মার্জনীয় নয়, তবু তা মানিয়ে যেত যদি আমার উদ্দেশ্য মহৎ এবং আচরণ অকপট হ'ত। শ্রমিকদের উদ্ধারের ছুতোয় যা করতাম, চলিত ভাষায় তার নাম—আড্ডা দেওয়া এবং অত্যন্ত বাজে কাজে সময় নষ্ট করা। তার মধ্যে ত্যাগ ছিল না, ছিল মুখোশ-পরা স্বার্থপরতা। তার প্রমাণ, শেষ পর্যন্ত ওই আড্ডা থেকেই স্বামীনির্বাচন ক'রে ঘর-সংসার গুছিয়ে বসেছি, শ্রমিকদের নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে হঠাৎ। আমার কম্‌রেড স্বামীটিও ক্যাপিটালিজ্‌মের বিরুদ্ধে ওজস্বিনী ভাষায় অনেক বক্তৃতা দিতেন, কিন্তু সুযোগ পাওয়া-মাত্র ক্যাপিটালিস্ট গভর্মেণ্টের অধীনে চাকরি নিতে তাঁর বাধে নি। এখন তাঁর হুকুমে পুলিস গুলি চালাচ্ছে ওই শ্রমিকদেরই উপর, কিষাণদের কাছ থেকে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় করছেন তিনি। গুজব—শীঘ্রই রায় সাহেব হবেন নাকি কর্মপটুতার জন্য। তুমিও তাঁর ভক্ত ছিলে একজন, সেদিন তোমার এক তাড়া চিঠি আবিষ্কার করলাম তাঁর ড্রয়ার থেকে। এখনও তুমি তাঁকে ভক্তি করতে পারছ কি না জানি না (শুনেছি, ভক্তির বিশুদ্ধতা নির্ভর করে ভক্তের একনিষ্ঠার উপর, ভক্তিভাজনের গুণাগুণের উপর নয়), আমি কিন্তু আর পারছি না। আত্ম-আবিষ্কার ক'রে নিজেরই উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছি। ছি ছি, কি লজ্জা! এতদিন যেটাকে তরবারি ব'লে আস্ফালন করেছিলাম, দেখছি, তাতে খাঁটি ইস্পাতের নাম-গন্ধ নেই, ঝুটো বীরত্বের রাঙতা দিয়ে মোড়া বাঁখারি সেটা। অশ্রদ্ধায় আত্মগ্লানিতে ম'রে যেতে ইচ্ছে করছে।

...আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। মানুষের মন শ্রদ্ধা

করবার জন্য সতত উন্মুখ। দেহের ক্ষুধার মত এটিও একটা ক্ষুধা। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে শ্রদ্ধেয়কে খুঁজে বেড়ায়। সমাজ বা শাস্ত্র যাঁদের শ্রদ্ধা করতে বলেছেন, যেমন পিতা মাতা বা স্বামী, তাঁরা সত্যিই যদি শ্রদ্ধাস্পদ হন, তা হ'লে জীবন চরিতার্থ হয়ে যায়; কিন্তু যদি না হন, তা হ'লে মন ভুল করে না। সমাজ বা শাস্ত্রের শাসন মেনে আমরা লেবেল-মারা পূজনীয়দের প্রতি মৌখিক একটা শিষ্টাচার করি বটে, কিন্তু মনে মনে আমরা সন্ধান ক'রে বেড়াই সত্যিকার শ্রদ্ধেয়কে। নিরন্তর এই সন্ধান চলেছে। দেহের ক্ষুধার মত এও অনিবার্য। এর প্রেরণায় মন ঘুরে বেড়ায় দেশ থেকে দেশান্তরে, পুস্তক থেকে পুস্তকান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে, জন্ম থেকে জন্মান্তরেও হয়তো।

অংশুমানবাবুকে দেখে প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল। সন্দেহ হবার কারণ আমার নিজের মধ্যেই ছিল। যে নিজে ভণ্ড, সে সত্যিকার ধার্মিককে প্রথমে চিনতে পারে না, ভণ্ড ব'লে মনে করে। তার নিজের দৃষ্টিই বক্র, মন স্বচ্ছ নয়, সে সহজে প্রসন্ন মনে কারও মহত্ত্ব স্বীকার করতে পারে না, নিজের ক্ষুদ্র চরিত্রের মাপকাঠি দিয়ে মাপতে গিয়ে সকলকেই সে ছোট ক'রে ফেলে। অহঙ্কারবশে ভাবতেই পারে না যে, কেউ তার চেয়ে বেশি ভাল হতে পারে। সত্য কিন্তু চাপা থাকে না বেশিদিন। অন্ধকারবিলাসী পেচককেও শেষ পর্যন্ত সূর্যের মহত্ত্ব স্বীকার করতে হয়। পেচক বিস্মিত হয় কি না জানি না, আমি কিন্তু হয়েছিলাম, ওইখানেই বোধ হয় আমি পেচকের চেয়ে বড়। পরে ভেবে দেখলাম, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এরাই তো চিরন্তন অগ্রণী, সর্বকালে সর্বদেশে এরাই তো আদর্শের পতাকা বহন করেছে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে সমস্ত সত্তা দিয়ে, আষাঢ়ের নবোদিত জলধরের মত আত্মবিসর্জন দিয়ে ধন্য করেছে পিপাসিত পৃথিবীকে।

এরা বিশেষ কোন দেশেরও নয়। এরা কংগ্রেসে আছে, কমিউনিস্ট পার্টিতে আছে, হিন্দু-মহাসভায় আছে। প্রাণের আবেগটাই এদের কাছে মুখ্য, দলটা নয়। প্রাণের আবেগে যে কোনও একটা দলে নাম লিখিয়ে এরা প্রাণপণ করে আদর্শ পালন করবার জন্য। আদর্শ ই এদের লক্ষ্য, দলটা উপলক্ষ্য মাত্র। অনেক সময় কোনও দলে নাম লেখাবার প্রয়োজনও হয় না এদের। এ সবই জানতাম। তবু যখন আগস্ট-আন্দোলনের ঢেউ আলোড়িত ক'রে তুলল চতুর্দিক, বিক্ষুব্ধ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আক্ষেপে সমস্ত দেশ বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল, দোষী-নির্দোষ বিচার না ক'রে বেপরোয়া মিলিটারি গুলি যখন রক্তস্রোত বইয়ে দিলে দেশের বুকে, ইতরভদ্র সবাই যখন সন্ত্রস্ত—কখন কি হয়, আমাদেরই এই শহরে ভদ্র গৃহস্থের বাড়িতে পুলিস ঢুকে থামে-বাঁধা স্বামীর সামনে ধর্ষণ ক'রে গেল যখন তার স্ত্রীকে, বৃদ্ধ বাপকে মারতে মারতে অজ্ঞান ক'রে দিলে, লোকের ঘর-বাড়ি নীলাম ক'রে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় করতে লাগল, তখন আমরা ঘরে খিল দিয়ে আরাম-কেদারায় ব'সে ব'সে 'রেন্‌বো' উপন্যাসে নাৎসি জার্মানির অত্যাচারের কাহিনী পাঠ করতে করতে রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম, আর কিছু করি নি। যদিও আমাদের দলের অনেকে বড়াই ক'রে বেড়াচ্ছেন—'অন্ প্রিন্সিপ্‌ল্' করি নি; আমি কিন্তু অকপটে স্বীকার করছি—করবার সাহস হয় নি। এসব নিয়ে বৈঠকখানায় ব'সে আলাপ করবার সাহস পর্যন্ত হয় নি স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে। অন্তরঙ্গদের কাছে নিম্নকণ্ঠে আলাপ করবার আগেও বাইরে গিয়ে দেখে এসেছি, আশেপাশে কেউ আছে কি না! কলেজ-জীবনে যাঁর শ্রমিকদুঃখকাতরতার অন্ত ছিল না, প্রাক্তন কম্‌রেড আমার সেই স্বামী যখন সশস্ত্র মিলিটারি বাহিনী নিয়ে গ্রামে গ্রামে শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যস্ত এবং আমি যখন ব্যস্ত সেই স্বামীর পরিচর্যায়, তখন

বিস্মিত হলাম অংশুমানবাবুর কাণ্ড দেখে। অতিশয় অপ্রত্যাশিত ব'লে মনে হ'ল ঘটনাটা। আমাদের বাড়ির সামনের মাঠে প্রকাশ্য দিবালোকে সভা ক'রে ওই মুখ-চোরা ছেলেটি ঘোষণা করলে—এর প্রতিশোধ আমরা নেব। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আমরা, এই হীন অপমান কিছুতেই সহ্য করব না, প্রাণ দিয়েও প্রমাণ করব যে, প্রাণের চেয়েও মান আমাদের কাছে বড়।

...আমি জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। দেখলাম—ওর চোখে মুখে অপূর্ব দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠেছে। কেন জানি না, হঠাৎ রাণা প্রতাপসিংহের কথা মনে প'ড়ে গেল। অত্যন্ত ছোট মনে হতে লাগল নিজেকে।...

ও-ই একমাত্র লোক যার সঙ্গে মাঝে মাঝে রাজনীতি নিয়ে চর্চা হ'ত, দেশের দুঃখ কষ্ট নিয়ে আলোচনা করতাম। আমাদের এ ধরনের আলোচনা যে কি রকম হয়, তা তোমাদের অজানা নেই নিশ্চয়। নিজেকে জাহির করবার আবেগে আত্মপ্রশংসার ফুলঝুরি কাটতে কাটতে এমন তন্ময় হয়ে যেতাম যে, ওর নীরবতাটা প্রথম প্রথম চোখেই পড়ত না। ও নীরবে ব'সে শুনত খালি। এমন একটা বিদ্বান ছেলে নীরবে আমার কথা শুনে যাচ্ছে বিনা প্রতিবাদে—যদিও এমন ঘটনা আমার জীবনে কখনও ঘটে নি, কারণ ইতিপূর্বে যাদের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাদের মধ্যে শ্রোতা ছিল না, বক্তা ছিল সবাই—তবু ওর নীরবতা বিস্মিত করে নি আমাকে। মনে হ'ত, ওটা আমার প্রাপ্য। সূক্ষ্ম একটা গর্বও অনুভব করতাম। ওর সশ্রদ্ধ নীরবতার অর্থও আমি করেছিলাম—আহা, বেচারা বই মুখস্থ ক'রে পরীক্ষাই পাস করেছে খালি, দেশের কোনও খবর রাখে না, দেশের সম্বন্ধে কোনও চিন্তাই করে নি বোধ হয়। দরিদ্র মজুর অসহায় কৃষকদের

আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে দেশের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার—]
এ কথা হৃদয়ঙ্গম করবার মত শিক্ষা হয় নি বেচারার, তাই আমার কথা শুনে তাক লেগে গেছে। ডেপুটি-গৃহিণী আমি, মনোহর শাড়ি ব্লাউজে সজ্জিত হয়ে সর্বাঙ্গে অলঙ্কারের ঝনৎকার তুলে গদি-আঁটা সোফায় ব'সে বিলিতি কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে দেশের দরিদ্র মজুর ও কৃষকদের মর্মস্পর্শী আলোচনা করতাম। ও চুপ ক'রে শুনত।

…তার পর এল আগস্ট-আন্দোলন। সেই আন্দোলনের পটভূমিকায় অংশুমানবাবুর স্বরূপ দেখে লজ্জায় ম'রে গেলাম। নিমেষে বুঝতে পারলাম, আমি চালিয়াৎ, ও কর্মী; আমি ভীরু, ও বীর; যে পুলিসের সম্বন্ধে কথা কইতে আমার গলার স্বর স্বতই খাটো হয়ে পড়ে, ও এগিয়ে যেতে পারে সেই পুলিসের অত্যাচার প্রতিরোধ করবার জন্যে। ওতে আর আমাতে কত তফাত! মনে হ'ল, এ কথা ওরও নিশ্চয় অবিদিত নেই। না জানি মনে মনে কত হেসেছে আমার লম্বা লম্বা বক্তৃতা শুনে। ওর সামনে দাঁড়াব কি ক'রে—এই সমস্যায় যখন আমি আকুল, ও-ই তখন এসে তার সমাধান ক'রে দিয়ে গেল।

…অন্ধকার রাত্রি। স্বামী টুরে বেরিয়ে গেছেন। কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। বন্দুক ঘাড়ে ক'রে মিলিটারি পুলিস ঘুরে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। নিঃশব্দচরণে অংশুমান এসে দাঁড়াল। ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল, সেই ক্ষণনিবদ্ধ দৃষ্টির মধ্যে কি যে দেখলাম আমি, আমার সমস্ত চিত্ত বিকশিত হয়ে উঠল, মনে হ'ল, ধন্য হয়েছি, কৃতার্থ হয়েছি, চরিতার্থ হয়েছি। তার পর স-সঙ্কোচে সে বললে, তোমার কাছে একটু দরকারে এসেছি…। আমার এক দূরসম্পর্কের দাদা ওর সহপাঠী ছিল, তাই ও আমাকে 'তুমি' বলত। সেই সূত্রেই আলাপও হয়েছিল।

আমার কাছে কি দরকার ?

সত্যিই অবাক লাগছিল, ভয়ও হচ্ছিল একটু একটু।

যে কাজে নেবেছি, তাতে টাকার দরকার। কিছু দিতে পারবে তুমি ? আমাদের অবস্থা তো জানই, কিছু টাকা পেলে সুবিধা হ'ত। পারবে দিতে ?

সংসার-খরচের কয়েক টাকা মাত্র হাতে ছিল। টাকা কুড়ি-পঁচিশের বেশি নয়। সে কটা হাতছাড়া করবারও উপায় ছিল না, কারণ স্বামী টুরে, ব্যাঙ্ক বন্ধ। সংসার অচল হয়ে পড়বে। তবু কিন্তু এ সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছে হ'ল না। মনে হ'ল, হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের এই একমাত্র উপায়। উঠে গিয়ে দেরাজটা খুললাম। যে জড়োয়া গয়নাগুলো আমার প্রিয়তম সম্পত্তি ছিল, তার বাক্সটা বার ক'রে এনে দিলাম তার হাতে।

টাকা নেই। এইগুলো নিলে যদি হয়, নিয়ে যাও।

সে একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাইলে আমার মুখের দিকে। তার পর বেরিয়ে চ'লে গেল। আর ফেরে নি।

এই ঘটনাটুকুর যে বৈজ্ঞানিক নির্যাস তুমি বার করবে তা আমি জানি। তবু তোমাকে সব কথা খুলে লিখলাম কেন, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি, তা হয়তো আমার পক্ষে অপমানজনক (মান-অপমানের প্রচলিত মানদণ্ড অনুসারে); তা হোক, তবু কোদালকে কোদাল বলতে আমি বাধ্য। নিজের এতবড় একটা কৃতিত্বের কথা তোমাকে না জানিয়ে পারছি না ভাই কিছুতেই। মনে হচ্ছে, এই বোধ হয় আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মনে হচ্ছে, এতদিনে নিজেকে ভারতবর্ষীয় নারী ব'লে পরিচয় দেবার

সামান্ত যোগ্যতা বোধ হয় অর্জন করলাম। তোমরা ইচ্ছে কর তো কম্‌রেড অন্তরার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করতে পার।

...কিন্তু ভুল বুঝো না আমাকে। মনে ক'রো না যে, আমি কমিউ-নিজ্‌মের উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন। যে সাম্যের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তোমাদের দলে যোগ দিয়েছিলাম, তোমাদের দলে তার অভাব দেখে সে দলের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছি, কিন্তু সাম্যের আদর্শ আমার ঠিক আছে। ওইটেই তো মানুষের চিরন্তন আদর্শ। তা ছাড়া কোন ইজ্‌মের উপরই আমার রাগ নেই, কারণ এটা বুঝেছি যে, সব নদীই শেষ পর্যন্ত সাগরে গিয়ে মিশবে যদি তার গতি অব্যাহত থাকে। ইজ্‌মটা বাইরের জিনিস, আসল জিনিস মনুষ্যত্ব। আমরা অনেকেই বাইরের খোসাটার নকল ক'রে মরছি, অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের সাধনা করবার ধৈর্য আমাদের নেই—এইটেই আমার দুঃখ। চিরকালই আমরা এই ক'রে এসেছি। আর্য ঋষিদের যজ্ঞক্রিয়া পাঁঠা-খাওয়া-উৎসবে পরিণত হয়েছে, বুদ্ধসঙ্ঘ পরিপূর্ণ করেছে অনাচারী শ্রমণ-শ্রমণীর দল, চৈতন্যের ধর্ম নেড়া-নেড়ীর ব্যভিচার হয়ে দাঁড়াল, মহাত্মাজীর অহিংস আন্দোলনকে মূলধন ক'রে কতকগুলো খদ্দরধারী গুণ্ডা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ক'রে বেড়াচ্ছে। কমিউনিজ্‌মের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। কাস্তে-হাতুড়ির লেবেল মেরে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই যা ক'রে বেড়াচ্ছে, তা মনুষ্যত্ব-চর্চা নয়, আত্মবিনোদন। জীবনের বাঁধা-ধরা পথে চলবার সুযোগ কিংবা সামর্থ্য এদের অনেকের নেই, অধিকাংশই জীবনযুদ্ধে অকৃতী। বিয়ে করে নি, নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাবার সামর্থ্য পর্যন্ত নেই। বাবা, দাদা বা ওই জাতীয় কারও ঘাড়ে চ'ড়ে পরশ্রীকাতরতার বিষোদ্‌গিরণ ক'রে বেড়াচ্ছে কেবল এবং নিজেদের অক্ষমতার দৈন্যটাকে ঢাকতে

চেষ্টা করছে কমিউনিজ্‌মের ঢক্কানিনাদে। বোঝে না যে, অশক্ত অসংযত ভণ্ড বা স্বার্থপর লোক গায়ে একটা লেবেল আঁটলেই লেনিন স্টালিন হয়ে ওঠে না। তার জন্যে সাধনা চাই, চরিত্রবল চাই। যে কোন একটা চ্যাংড়া ছোঁড়া ফড়ফড় ক'রে কমিউনিজ্‌মের বুলি আওড়ায় যখন, তখন লজ্জা হয় আমার। কবে আমরা বুঝতে শিখব যে, শুধু বুলি আওড়ালেই সিদ্ধি হয় না। সিদ্ধির জন্য সাধনা চাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুকরণে অনেকেই এ দেশে দাড়ি রেখে উপনিষদের বুলি আওড়ালে, কিন্তু তার ফল কি হয়েছে ?...

এত দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনা পেয়েছি একটি কথা ভেবে যে, অধিকাংশই মেকি হতে পারে, কিন্তু খাঁটি লোকও আছে। এরা আছে ব'লেই আশা আছে। ইতিহাসে এদের কাহিনী পড়েছি, আমাদের দেশের রাজনৈতিক বিপ্লবে দেখেছি এদের দ্যুতিমান আবির্ভাব। এরা সংখ্যায় কম। তাতে ক্ষতি নেই, একটি সূর্যই অন্ধকার ধ্বংস করে। আর আমার বেশি কিছু বক্তব্য নেই। আশা করি, যা বললাম তার মধ্যেই তোমার চিঠির উত্তর পেয়েছ। আমার ভালবাসা জেনো। ইতি

তোমারই
অস্তরা

১১

ইলেকট্রিসিটির বইখানা নিয়ে গেছে। মনের সঙ্গে যে নির্জনে বোঝাপড়া করবে তারও উপায় নেই। দু ঘণ্টা অন্তর পুলিসের লোক আসছে। প্রতিবারই নূতন লোক। জেরা চলছে ক্রমাগত। সঙ্গত-অসঙ্গত নানা প্রশ্ন। গাল দিচ্ছে। তাকে, তার বাবাকে, বংশকে,

দেশকে, দেশের নেতাদের। অকথ্য, অশ্রাব্য গালাগালি।...ঘুমে চোখ বুজে আসছে, দেহ অবসন্ন, কিন্তু ওরা থামবে না। দু ঘণ্টা অন্তর নূতন লোক আসছে। জেরার পর জেরা, প্রশ্নের পর প্রশ্ন, গালাগালির ঝড় বইছে। ঘুমুতে দেবে না। নির্বাক হয়ে শুনে যেতে হচ্ছে খালি। নির্বাকও থাকতে দিচ্ছে না...সঙ্গত অসঙ্গত নানা প্রশ্ন...যা-হোক কিছু একটা উত্তর দিতেই হচ্ছে...একই উত্তর সহস্র বার দিয়েছে, আবার দিতে হচ্ছে। চুপ ক'রে থাকলে গাল দিচ্ছে। জানি না, জানি না, জানি না, জানি না—কতবার বলা যায় এক কথা! কিন্তু ওরা থামবে না। একই কথা শুনবে বার বার। বলছে—ব'লে যাচ্ছে ক্রমাগত। বসতে দেবে না, দাঁড় করিয়ে রেখেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শরীরের রক্ত ফুটছে টগবগ ক'রে, জিব শুকিয়ে আসছে, জোর ক'রে চাইতে গিয়ে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বাইরে শান্তভাব বজায় রেখে তবু ব'লে যেতে হচ্ছে—জানি না, জানি না, জানি না।

শেষ সি. আই. ডি. ইন্‌স্পেক্টার বিদায় নিয়ে যাবার আগে ব'লে গেলেন, তিনটে বাজল, এবার উঠি, আবার আসব কাল। ভাল ক'রে ভেবে দেখুন ইতিমধ্যে।

অন্ধকার ঘরে একা ব'সে রইল অংশুমান।

১২

নিশ্ছিদ্র নিবিড় অন্ধকার।

পথ। যে পথ মানুষ সৃষ্টি করে গতিকে মুক্তি দেবার জন্যে, সেই পথই আবার মানুষ বন্ধ করে মানুষেরই গতি-রোধ আকাঙ্ক্ষায়। মানুষই মানুষের সর্বপ্রধান শত্রু...

ঠক্ ঠক্ ঠকাঠক···সন্তর্পণে, কিন্তু অনবরত পড়ছে আঘাতের পর আঘাত। দশজন অন্ধকারে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে কুড়ুল চালিয়ে যাচ্ছে। গাছ ফেলে রাস্তা বন্ধ করতে হবে। মিলিটারি মোটর না আসতে পারে যেন। ঘর্মাক্তকলেবরে কুড়ুল চালাচ্ছে সবাই, ধরা পড়লে মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও। হাত কাঁপছে না কারও। দৃঢ়-নিবদ্ধ ওষ্ঠ, চোখে আগুন জ্বলছে সকলের। সকলেই যুবক নয়। বৃদ্ধ আছে, বালকও আছে।

নিন বাবু-মশায়, আমার নৌকোটাও।

সারি সারি নৌকো জমা হচ্ছে ঘাটে-আঘাটায়। প্রত্যেকটার তলা ফেঁড়ে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মালিকরা নিজেরাই দিচ্ছে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দিতে হচ্ছে সকলকেই। দেশব্যাপী এই অপমানের প্রতিবাদ করতেই হবে। নদী পেরিয়ে পুলিস যেন না আসতে পারে। জনতার বিপুল দাবি, দিতে হবেই নৌকো সকলকে। দেখতে দেখতে সব কটা নৌকো ডুবে গেল। ওপারের দিকে চাইলে অংশুমান। অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। আকাশে মনে হ'ল মেঘ করেছে একটু। মেঘের কোলে নক্ষত্র জ্বলছে। এক ঝলক হাওয়া ছুটে এল কোথা থেকে আচমকা। তালগাছের পাতাগুলো হড়মড় ক'রে উঠল। শিহরণ জাগল নদীর জলে। অংশুমান সওয়ার হ'ল বাইকে, অনেক জায়গায় যেতে হবে এখনও।

মার গাঁইতি, হ্যাঁ, দাও আর এক ঘা—

আরে, কোদাল চালাও না ওই দিকটাতে। ভয় কি, ভাবছ কি তুমি?

মায়া হচ্ছে।—হেসে বললে একজন, নিজের হাতে গেঁথেছিলাম একদিন···

হ্যাঁ, চার আনা মজুরির বদলে, সাহেবদের মোটর যাবে ব'লে।

পড়তে লাগল কোপের পর কোপ।

হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ল পুলটা।

ছুটল সবাই অন্ধকার মাঠ ভেঙে।

অদৃশ্য হয়ে গেল নিমিষে...

রাস্তায় বড় বড গর্ত খোঁড়া হচ্ছে। টেলিগ্রাফের তার একটাও নেই। খুঁটিগুলো পর্যন্ত উপড়ে ফেলেছে সবাই মিলে। টেলিফোনের তারও কাটা হয়ে গেছে...। অংশুমানের দেখা হয়ে গেল হঠাৎ দারোগারই সঙ্গে।

কে?

প্রদীপ্ত টর্চের আলোটা পড়ল মুখের উপর। পালাবার উপায় রইল না। বাইক থেকে নাবতে হ'ল।

আমি অংশু।

আপনি! এতরাত্রে এ দিকে কোথা গিয়েছিলেন?

মনে হ'ল, কতকগুলো লোক টেলিগ্রাফের তার কাটছে, তাই বেরিয়েছিলাম যদি তাদের ধরতে পারি...

পাগল ক'রে দেবে দেখছি ব্যাটারা। গেল কোন্ দিকে? আমিও তাদের সন্ধানে বেরিয়েছি।

ওই যে ওই দিকে, বাগানের অন্ধকারে স'রে পড়ল সব।

যেদিকে লোকগুলো সত্যিই পালিয়েছিল, ঠিক তার উল্টো দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে দেখিয়ে দিলে অংশুমান। বিভ্রান্ত দারোগা ছুটল সেই দিকে...

...পোলাণ্ড।

একটি ছোট বোর্ডিং-স্কুল। পঁচিশটি মেয়ে সারি সারি ব'সে আছে। কুৎসিত-দর্শনা একটি শিক্ষয়িত্রী পড়া নিচ্ছেন। দশ বছরের একটি মেয়ে মেরী সুক্লাডোওয়াস্‌কা পড়া ব'লে যাচ্ছে। পোলিশ ভাষায় পোলাণ্ডের একটি রাজার কাহিনী। তন্ময় হয়ে শুনছে সবাই। টুঁ শব্দটি নেই। বে-আইনী কাজ হচ্ছে। জার-শাসিত পোলাণ্ডে পোলিশ ভাষায় কিছু পড়াবার হুকুম নেই। তবু কিন্তু পড়ানো হচ্ছে লুকিয়ে। স্কুলের দারোয়ান থেকে আরম্ভ ক'রে হেডমিস্‌ট্রেস পর্যন্ত সকলেই এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অন্যায় আইন মানবে না তারা।···হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিক ঘণ্টাটা বেজে উঠল, জোরে নয় আস্তে। সঙ্কেত! চমকে উঠল সবাই। নিশ্চয় আসছে কেউ। নিমেষের মধ্যে চারটি মেয়ে ইতিহাসের বইগুলো কুড়িয়ে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ত্বরিতপদে। সেগুলো লুকিয়ে রেখে ফিরে এল আবার। সেলাই নিয়ে বসল সব, যেন এতক্ষণ সেলাই নিয়ে ছিল সবাই। রাশিয়ান ইন্‌স্‌পেক্টার ঘরে ঢুকলেন।

শিক্ষয়িত্রীটি উঠে বললেন, এ দু ঘণ্টা আমরা মেয়েদের সেলাই শেখাই···

আপনি কি যেন পড়ছিলেন একটা?

ওদের গল্প প'ড়ে শোনাচ্ছিলাম। এই যে—

রাশিয়ান হরফে ছাপা কেতাদুরস্ত একখানা গল্পের বই আগে থাকতে টেবিলে রাখাই ছিল, দেখালেন সেটা। সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে সেটা উলটে-পালটে দেখে রাশিয়ান ইন্‌স্‌পেক্টার তার পর পরীক্ষা শুরু করলেন। রাশিয়ার জারেদের নাম, তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠির নাম, তাদের প্রত্যেকের উপাধি কি কি, কটমট নামের বিরাট বিরাট তালিকা আবৃত্তি করতে হ'ল। নির্ভুলভাবে আবৃত্তি ক'রে গেল সেই দশ বছরের মেয়েটি। মেরী সুক্লাডোওয়াস্‌কা···ভবিষ্যৎ মাদাম ক্যুরি।

শত্রুর কাছে মিছে কথা বলায় পাপ নেই।

···না, না···।

আপনি কি দেখেছিলেন ?

আমি দেখেছিলাম যে, উনি বাইক ক'রে এসে ভলান্টিয়ার যোগাড় করছিলেন তার কাটবার জন্যে। আমাকেও যেতে বলেছিলেন।

আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে অংশুমান। সাক্ষীর পর সাক্ষী আসছে যাচ্ছে। সে কিন্তু কিছু শুনছে না। তার মানসপটে শুধু জাগছে ছবির পর ছবি। আর কানে বাজছে—যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই কাছে যাব···। অদৃশ্য অপরা-তড়িৎ ক্রমাগত ব'লে চলেছে পরা-তড়িতের উদ্দেশে—যাব, যাব, তোমারই কাছে যাব···

হ্যাঁ যাবই, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যাব···

এগিয়ে চলেছে জনতা। সামনেই থানা। লাল-পাগড়িতে ভ'রে গেছে চারিদিক। খাকি-পোশাক-পরা মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে বেওনেট উঁচিয়ে। জনতা এগিয়ে চলেছে তবু।

ফায়ার···

শুরু হয়ে গেল গুলি। পতাকাধারী প'ড়ে গেল একজন। পতাকা পড়ল না কিন্তু···ভূলুণ্ঠিত রক্তাক্ত বীরের দৃঢ়মুষ্টিতে সোজা খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। যতক্ষণ প্রাণ ছিল, পতাকার মান রেখেছিল সে। গুলি চলছে··· লোক মরছে। অগ্রগতি বন্ধ হচ্ছে না কিন্তু···এগিয়ে চলেছে··· জনতা···

সর্বাঙ্গে গুলি লেগেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে চতুর্দিক, গিরগিটির মত হামাগুড়ি দিয়ে বুকের ভরে এগিয়ে চলেছে একজন। দুটো পা-ই

জখম হয়েছে, দাঁড়াবার শক্তি নেই। কিন্তু তবু সে যাবে, মরবার আগে থানায় সে পৌঁছবেই। পণ সে রক্ষা করবেই…

এসেছি, এসেছি এই দেখ, তোমরাও এস…

থানার বারান্দায় উঠে হাসিমুখে ব'লে উঠল সে। রগের উপর একটা গুলি বিঁধল এসে। মুখ থুবড়ে পড়ল। মুখে হাসি।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিস্পন্দ অংশুমান ছবির পর ছবি দেখছে শুধু, হঠাৎ জজ সাহেবের মুখটা চোখে পড়ল। দেশী জজ। যা শুনছে তাই লিখে যাচ্ছে, যে যা বলছে তাই টুকে যাচ্ছে। নির্বিকার। একটা গল্প মনে প'ড়ে গেল। গল্প নয়, ইতিহাস। ট্রট্স্কির লেখা রাশিয়ান বিদ্রোহের ইতিহাসে আছে—চতুর্দিকে বিদ্রোহ যখন আসন্ন, অত্যাচারে অবিচারে ষড়যন্ত্রে রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত যখন ব্যতিব্যস্ত, ঘরে বাইরে কোথাও স্বস্তির চিহ্নমাত্র নেই, প্রলয়ের ঢেউ প্রাসাদের সিংহদ্বারে যখন ভেঙে পড়ছে, তখন জ্বার নিকোলাস নাকি নিরতিশয় উদাসীন ছিলেন। প্রমাণ তাঁর তখনকার রোজনামচা। অনেকক্ষণ বেড়ালাম, দুটো কাক মারলাম, দিনের আলোয় ব'সে চা খাওয়া গেল, পাতলা কামিজ গায়ে দিয়ে বেরিয়েছি আজ, নৌকো বাইলাম, একটু পড়েছি—রোজনামচায় এইসব লেখা খালি। আসন্ন বিদ্রোহ সম্বন্ধে একটি কথা নেই, স্বাভাবিক ছন্দে জীবন ব'য়ে চলেছে যেন। সামান্যতম উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানীরা পোর্ট আর্থার দখল করেছিল যখন, তখনও তিনি নাকি এমনই নির্বিকার ছিলেন। তাঁর পারিষদ্‌রা তাঁর অদ্ভুত আত্মসংযম দেখে অবাক হয়ে যেতেন, অনেকে বলতেন, এ ঔদাসীন্য আভিজাত্যের লক্ষণ। ট্রট্স্কি বলেছেন, এর আসল কারণ আধ্যাত্মিক দৈন্য। উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত হতে হ'লে

যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন, নিকোলাসের তা ছিল না। তিনি ছিলেন জন্ম-অসাড়। এ লোকটাও তাই নাকি।…অংশুমান আর একবার জজ-সাহেবের মুখের দিকে চাইলে। জীবনের কোন লক্ষণ নেই। যে জাল ছিন্ন করবার জন্তে দেশশুদ্ধ লোক বিদ্রোহ করেছে, সে জালে উনিও যে আবদ্ধ তার কোন বোধ ওঁর চোখে মুখে পরিস্ফুট নয়। মানুষ নয়, একটা মুখোশ-পরা যন্ত্র যেন ব'সে আছে কোট প্যাণ্ট প'রে, যে যা বলছে টুকে যাচ্ছে…

মেঘ ক'রে আসছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশের খানিকটা। পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন নীল মেঘে ছেয়ে ফেলেছে চারিদিক। তাদের বাড়ির পাশে যে কদমগাছটা আছে, তার পুষ্পকেশরে কি রোমাঞ্চ জেগেছে! চারিদিক কি স্নিগ্ধ সুন্দর হয়ে আসছে! কি নিবিড়! সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ… হঠাৎ মেঘদূত মনে প'ড়ে গেল। ত্বামারূঢ়ং পবন পদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসন্ত… আজও কি পথিকবনিতারা বিশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে অলকদাম উত্তোলন ক'রে পবনপথারূঢ় আষাঢ়ের মেঘের দিকে চেয়ে থাকে… দেশের কি সে অবস্থা আছে এখন আর? অন্তরা কোথায় এখন কি করছে, কি ভাবছে, ডেপুটির গৃহিণী হয়ে সুখে আছে কি সে, তার মত মেয়ের পক্ষে থাকা সম্ভব কি, জড়োয়া গয়নার কথা তার স্বামী কি টের পেয়েছে?…

দপ ক'রে ইলেক্ট্রিক আলো জ্ব'লে উঠল। "যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই কাছে যাচ্ছি, নানা বাধা বিঘ্ন বহু জটিল পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে, কিন্তু তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছবই…"

অপরা-তড়িত পরা-তড়িতের কাছে যেতে চায়, তাই তো আলো জ্বলে, পাখা ঘোরে, এরোপ্লেন ওড়ে, রেডিও বাজে। তার এ আগ্রহ

না থাকলে থেমে যেত সব। সহসা অংশুমানের মনে হ'ল, এমনই এক-একটা আগ্রহের টানেই তো গ'ড়ে উঠেছে এক-একটা সভ্যতা। স্বর্গের টানে বৈদিক, ব্রহ্মের টানে ঔপনিষদিক, নির্বাণের টানে বৌদ্ধ, প্রেমের টানে বৈষ্ণব, অপরা-তড়িতের টানেও তেমনই গ'ড়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক সভ্যতা। অস্তরার টানে সেও হয়তো বড় কিছু একটা করবে। কিন্তু তখনই মনে হ'ল, কতটুকু ক্ষমতা তার, কি করতে পারে সে!

"...যখন দাদোজির সঙ্গে সহ্যাদ্রির শিখরে দাঁড়িয়ে ভগবানের সমক্ষে আমি শপথ করেছিলাম যে, ভারতে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের জন্য আমি প্রাণপণ করব, তখন আমার ক্ষমতা কতটুকু ছিল! তখন আমার বয়স আঠারো বছর মাত্র..."

সপ্তদশ শতাব্দীর স্তব্ধতা ভেদ ক'রে ভেসে এল শিবাজীর কণ্ঠস্বর।

তুমি নয়, আমি নয়, জয়ী হয় ধর্ম। ধর্মের ধ্বজাবাহক আমরা, তাই আমাদের একমাত্র ভরসা। ধর্মই আমাদের শক্তি...

রাজদম্পতির প্রকাণ্ড যে তৈলচিত্রটা টাঙানো ছিল সামনে, তা অবলুপ্ত ক'রে ফুটে উঠল ছত্রপতি শিবাজীর ছবি, অশ্বারোহণে ছুটে চলেছেন শত্রুজয় করতে।

আর্তের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

শত্রুর কবলে মরণাপন্ন আমরা নিজেরই ঘরে বন্দী হয়ে আছি, শত্রুর প্রহরী পাহারা দিচ্ছে দ্বারে। অন্ন নেই, পানীয় নেই, কোথায় তুমি ত্রাণকর্তা, ছুটে এস...

ছুটে চলেছে মারহাট্টা বীর হাম্বীর রাও।

প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হ'ল একটা...চমকে উঠল আদালত।

যাবই আমি।—কে যেন বজ্রকণ্ঠে বললে, অংশুমানের মনে হ'ল।

আবেগ যদি প্রবল হয়, দুস্তর বাধাও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় নিমেষে।

অংশুমানের সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল সহসা। অন্তরা অন্তরা, কোথায় তুমি…? পরক্ষণেই লজ্জিত হয়ে পড়ল সে। পরস্ত্রীর সম্বন্ধে এ কি চিন্তা! এ কি ভাবছে সর্বদা, ছি ছি! কেন এ দুর্বলতা, কেন, কেন, কেন? এই দুর্বল চরিত্র নিয়ে কোন্ সাহসে এই কঠিন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছি! এতটুকু মনের জোর নেই, যুঝব কি ক'রে শেষ পর্যন্ত? এমন দুর্বল চরিত্র নিয়ে যুঝতে কি পেরেছে কেউ কখনও? সহসা শম্ভুজীর ছবিটা চোখের সামনে ফুটে উঠল—চরিত্রহীন মদ্যপ শম্ভুজী। ঔরঙ্গজেবের বন্দী শম্ভুজী। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে মৃত্যু। রাজী হ'ল না শম্ভুজী। ইসলাম নয়, মৃত্যুকেই বরণ করবে সে। একে একে চোখ উপড়ে নেওয়া হ'ল, তপ্ত লোহার সাঁড়াশি দিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলা হ'ল জিব। চরিত্রহীন মদ্যপটা বিচলিত হ'ল না তবু। শিবাজীর অযোগ্য পুত্র ছিল যে সারাজীবন, মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে যোগ্যতা অর্জন করলে সে। অন্ধ শম্ভুজী যেন চেয়ে আছে তার দিকে, ঠোঁট দুটো ন'ড়ে উঠল,…যেন বললে, তুমিও পারবে।

আপনি কি দেখেছিলেন?

ডেপুটি সাহেবকে মোটর থেকে জোর ক'রে নাবাচ্ছেন উনি।

আর কে কে ছিল?

অনেক লোক ছিল। আমিও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম, অংশুমানবাবু এগিয়ে গিয়ে ডেপুটি সাহেবের হাতটা চেপে ধরলেন।

সাক্ষীর পর সাক্ষী আসছে, যাচ্ছে।

সকলেরই মুখে এক কথা—স্বচক্ষে দেখেছি।

···আবার সেই নির্জন কারাগার।

সমস্ত মন অসাড় হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, সমস্ত জ'মে গেছে যেন ভিতরে। খটাৎ ক'রে শব্দটা হতেই চমকে উঠল সে। জগদ্দল পাথরের মত অনড় অচল ভাষাহীন যে বোধটা নিদারুণ চাপে নিপীড়িত করছিল মনকে, সজাগভাবে যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করবার উৎসাহ সে পায় নি এতক্ষণ, তালা-বন্ধ হওয়ার শব্দে ভেঙে পড়ল সেটা যেন খানখান হয়ে, ছড়িয়ে পড়ল টুকরোগুলো প্রত্যক্ষ চেতনার সামনে। তার স্বরূপ অগোচর রইল না আর। সব দেশী লোক! জজ দেশী, দারোগা দেশী, পুলিস দেশী, জেলার দেশী, দলে দলে তার নামে যারা মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে গেল সব দেশী! সে নির্দোষ নয় তা ঠিক, কিন্তু এরা যা ব'লে গেল তা সব বানানো—একটা কথাও সত্য নয়। কিসের লোভে মিথ্যে কথা বললে এরা?

তুমিও তো সত্য কথা বল নি। তুমিও মিথ্যা কথা ব'লে চলেছ ক্রমাগত···

অদৃশ্য বিবেকের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল হঠাৎ। চমকে উঠল অংশুমান। নিক্তি ধ'রে এ লোকটা ব'সে আছে তো ঠিক, এত বিপর্যয়েও বিপর্যস্ত হয় নি একটুও। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল ক্ষণিকের জন্যে। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যেই। পর-মুহূর্তেই ব'লে উঠল, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। আমি মিছে কথা বলেছি বৃহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, দুষ্টকে দমন করবার জন্যে, স্বদেশের স্বাধীনতা কামনায়। যুধিষ্ঠির থেকে আরম্ভ ক'রে পৃথিবীর অনেক মহাপুরুষের জীবনেই এ রকম প্রবঞ্চনার উদাহরণ পাওয়া যাবে। নির্জন অন্ধকারে কথাগুলো অদ্ভুত শোনাল। জোরে বলার কোন দরকার ছিল না তো! পোড়া ডেপুটির মুখখানা চোখের উপর ভেসে উঠল আবার। দাম্ভিক, বর্বর

পাষণ্ড। কামুকও। শুধু যে কর্তব্যকর্মের অনুবোধে বাধ্য হয়ে নারীধর্ষণের হুকুম দিয়েছিল তা নয়, সেটা উপভোগও করেছিল। বহুবার-ধর্ষিতা একটি মেয়ের চেহারা মনে পড়ল। কি অসহায় করুণ দৃষ্টি তার চোখে! মুখে কথা নেই, দাঁড়াতে পারছে না ভাল ক'রে! থরথর ক'রে কাঁপছে, উত্তর দিচ্ছে না কারও কথার···শুনতে পাচ্ছে না বোধ হয়, চেয়ে আছে শুধু। মনে হ'ল, শুধু একজন নয়, সারা দেশ জুড়ে সহস্র সহস্র নারী যেন চেয়ে আছে তার দিকে। এই সব অসহায় মূক-বধিরদের মুখে ভাষা দেবে কে? অসংখ্য রক্তকণা তাণ্ডব নৃত্য শুরু করছে সারা দেহে···অগ্নির ঝড় বইছে মাথার ভিতর। ন্যায়পরায়ণ বিবেক কোথায় উড়ে গেল সেই ঝঞ্ঝায়! আচ্ছন্নের মত প'ড়ে রইল অংশুমান। সমস্ত চেতনা জুড়ে একটি কথাই স্পন্দিত হতে লাগল বারম্বার—এই সব অসহায় মূক-বধিরদের মুখে ভাষা দেবে কে···আমি কি পারব?

না পারবার কি আছে!

হাস্যপ্রদীপ্ত একখানি মুখ ফুটে উঠল চোখের সামনে। অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে গেল। প্রদীপ্ত চোখ দুটি থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ধপধপে সাদা দাড়ি, সাদা চুল, সাদা ভুরু। সমস্ত মুখে কিন্তু ফুটে রয়েছে যৌবনের জয়শ্রী। তারুণ্যের তিলক জ্বলজ্বল করছে প্রশস্ত ললাটের মধ্যস্থলে অদৃশ্য অগ্নিশিখার মত।

মূক-বধিরদের নিয়ে অনেক কাল কাটিয়েছি। তাদের মুখে ভাষা দেওয়া সহজ। তারা জীবন্ত, তারা কথা কইতে উৎসুক। তার চেয়েও শক্ত কাজ আমি করেছি, জড়-লোহাকে কথা কইয়েছি বিদ্যুতের স্পর্শ দিয়ে। মড়ার কান চিরে যখন দেখলাম যে, সামান্য একটা পর্দার কম্পনই শ্রুতির কারণ, তখন মনে হ'ল, লোহার পাতলা পর্দায় সে

কম্পন সঞ্চার করা অসম্ভব হবে কেন বিদ্যুতের স্পর্শ দিয়ে? লেগে গেলুম…

হাসিমুখে চেয়ে রইলেন। পর-মুহূর্তেই কিন্তু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

ওই দেখ, স্বভাব না যায় ম'লে! এখনও মনে হচ্ছে, আমি করেছি। পড়েইছ তো, আসলে ব্যাপারটা ভূতুড়ে কাণ্ডের মত অদ্ভুত। ওয়াট্‌সনের ট্র্যান্‌স্‌মিটিং স্প্রিং একটা বিগড়ে গেল, সে সেটা নিয়ে টানাটানি শুরু করতেই আমি পাশের ঘরে শব্দ শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখি, মেক-ব্রেক পয়েণ্ট দুটো জুড়ে গেছে। বাস্‌, টেলিফোন আবিষ্কারের থেই পেয়ে গেলাম। কি ক'রে জুড়ল, ঠিক ওই সময় জুড়ল কেন, আমারই বা কানে গেল কেন—সেইটেই রহস্য এবং সেইটেই বোধ হয় আবিষ্কারের আসল কারণ। সে যাক, কিন্তু there's a lesson for you—রহস্যটা নয়, ওয়াট্‌সনের ওই গোলমাল ক'রে ফেলাটা—অপ্রত্যাশিতভাবে স্প্রিঙের মেক-ব্রেক পয়েণ্ট দুটো জুড়ে যাওয়াটা। প্ল্যান ক'রে বড় কিছু প্রায়ই হয় না, গোলযোগের মধ্যেই অদ্ভুত যোগাযোগ হয়ে যায়। হিমালয় বা প্রশান্ত মহাসাগর কোন ইঞ্জিনীয়ার প্ল্যান ক'রে করতে পারত না। সুতরাং বিদ্রোহ ক'রে দেশে বিশৃঙ্খলা এনেছ ব'লে তোমাদের খুব বেশি লাঞ্ছিত হবার কারণ নেই। বহু বৈজ্ঞানিক বহু বহু বুদ্ধি খাটিয়ে যে সমুদ্রে পুল বাঁধতে পারে না, সেই সমুদ্র একদিনে শুকিয়ে যেতে পারে খামখেয়ালী ভূমিকম্পের ধাক্কায়, মানে…well, I did not like to talk, but I am talking like a parrot…

হঠাৎ থেমে পিছনে দু হাত দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সারা ঘরময়। অস্থির যে যুবক একদা বোস্টন ইউনিভার্সিটিতে ভোকাল

ফিজিওলজির অধ্যাপক ছিল, সে-ই যেন আবার মূর্ত হয়ে উঠল বৃদ্ধ গ্রেহাম বেলের মধ্যে। হঠাৎ তিনি দু হাত দিয়ে মাথার চুল মুঠি ক'রে ধ'রে ঘরের মেঝের দিকে চেয়ে রইলেন। অংশুমানের মনে হ'ল, কি যেন খুঁজছেন তিনি।

আপনি খুঁজছেন নাকি কিছু?

হ্যাঁ, শান্তি। আলো নয়, অন্ধকার। শব্দ নয়, নৈঃশব্দ্য। জীবনের শেষে ঘর থেকে টেলিফোন দূর ক'রে দিয়েছিলাম আমি। It is a nuisance…এখন দেখছি, চিন্তার ডাকেও সাড়া দিতে হয়। There is no escape…

তার পর হেসে বললেন, তোমাকে আমার মত হতে বলছি না তা ব'লে। হতে পারবেও না। সেলেনিয়মের উপর আলো পড়লে তার রেজিস্ট্যান্স্ যেমন বদলে যায়, তোমার মনের উপরও তেমনই পড়ছে প্রেরণার আলো। নানা রকম কারেণ্ট পাস করবে এখন। আমার ফোটোফোনের কথা পড়েছ তো, তার নয়—আলোর রেখা বার্তা বহন করেছিল, মনে আছে?

আছে।

তোমার মনের ওপরও তেমনই ভেঙে পড়েছে অসংখ্য আলোর অসংখ্য রকম তরঙ্গ। অসহায় সোলার টুকরোর মত ভেসে বেড়াও এখন নানা তরঙ্গের শিখরে শিখরে। ডুবতে হবে, উঠতে হবে, ভাসতে হবে। ওর থেকেই কিছু একটা হয়ে উঠবে হয়তো, যদি হবার হয়। ভেবে চিন্তে প্ল্যান ক'রে কিছু হবে না। বার্তা বহন ক'রে যাও ক্রমাগত, ঠিক-বেঠিক যা হোক…আঃ, সিকেনিং!

সমস্ত মুখ বিরক্তিতে ভ'রে গিয়ে হাস্যদীপ্ত হয়ে উঠল আবার পর-মুহূর্তেই। যেন সামলে নিলেন।

এই এখন তোমার একমাত্র কাজ। মূক-বধিরদের নিয়ে মাথা ঘামাও যদি, এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। Carry on…আমি এখন চলি। আমাকে আর ডেকো না ··please, I want peace, nothing but peace. Good night.

চ'লে গেলেন।

অংশুমান বিস্মিত হয়ে ব'সে রইল।

প্ল্যান ক'রে কিছু হবে না?…

…গ্যাল্‌ভানি, অর্‌স্টেড, বেকেরেল, রণ্টগ্যেন…সারি সারি আরও অনেকে এসে দাঁড়ালেন। সকলেরই চোখে সকৌতুক দৃষ্টি। এঁদের প্রত্যেকরই আবিষ্কার যুগান্তকারী, কিন্তু প্রত্যেকটা আবিষ্কারই আকস্মিক। সকৌতুক দৃষ্টিতে নীরবে এই তথ্যটুকু নিবেদন ক'রে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সবাই আবার…

কারাগারের সূচীভেদ্য অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে উঠল। প্ল্যান ক'রে কিছু হবে না? আমাদেব এই যে এত বছরের এত প্ল্যান, এর কি মূল্য নেই কোনও? সব বিদ্রোহের মূলেই তো প্ল্যান থাকে। রাশিয়ার ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান…বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর রাজনীতি এক নয়… গুলিয়ে ফেলছি আমি…বিজ্ঞান…

যে কোনও বিষয়ের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান।

অংশুমান ফিরে দেখলে, নির্নিমেষ এক জোড়া চোখ তার দিকে চেয়ে আছে। বিরাট শ্মশ্রুসমন্বিত গম্ভীর মুখ। অনড় নিস্পন্দ। ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল।

যে কোনও বিষয়ের জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান। কোনও নীতিই বিজ্ঞানের বহির্ভূত নয়, রাজনীতিও নয়। জ্ঞানমাত্রেই নিয়মের অধীন, পৃথিবীতে অনিয়ম ব'লে কিছু নেই। যা অনিয়ম ব'লে মনে হয়, আসলে তা

জ্ঞানের অভাব, পর্যবেক্ষণ-শক্তির অপটুতা। নেপ্‌চুনকে দেখবার ঢের আগে অ্যাডাম্‌স্‌ তার অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন, হ্যালি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাবের, অনেক ধাতু আবিষ্কৃত হবার পূর্বেই তাদের অস্তিত্ব নির্দেশ করতে পেরেছেন বৈজ্ঞানিক মলিকিউলার ওয়েট থেকে। কি ক'রে সম্ভব হ'ল এসব? অঙ্ক ক'ষে। সমস্ত বিশ্বব্যাপার নিয়ন্ত্রিত ব'লেই অঙ্ক ক'ষে ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক ওয়েভের কথা আমি বলতে পেরেছিলাম, হারৎজ্‌ হাতে-কলমে সেটা প্রমাণ করলেন অনেক পরে। পৃথিবীতে বিশৃঙ্খল কিছু নেই, থাকতে পারে না। মিস্টার বেলের ভুতুড়ে কাণ্ডটাও বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারেই ঘটেছিল। আমি আইনজ্ঞ উকিলের ছেলে, বে-আইনী কথা মানি না। মিস্টার বেলের কথায় দ'মে যাবার দরকার নেই, সহস্র উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ ক'রে দেওয়া যায় যে, একটা বিশেষ নিয়ম অনুসরণ ক'রে প্ল্যান অনুযায়ী যাঁরা ঠিকমত চলতে পেরেছেন, তাঁরা অনেক বড় কাজ করতে পেরেছেন পৃথিবীতে। তার পর একটু ভেবে বললেন, এই ধর না যেমন আল্‌ভা এডিসন। ওই বেলেব টেলিফোনেরই কত উন্নতি করেছেন তিনি, গ্রামোফোন বানিয়েছেন, ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব্‌ তৈরি করেছেন, আরও কত কি করেছেন···

কি বলছ আমার নামে?

আল্‌ভা এডিসন এসে দাঁড়ালেন। গোঁফ-দাড়ি নেই, ভারী মুখ, চোখের দৃষ্টিতে সপ্রশ্ন কৌতুক, বলিষ্ঠ নাকটা নীরবে যেন লোকটার ব্যক্তিত্ব ঘোষণা করছে। এডিসনের আবির্ভাবে ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের চোখে-মুখে প্রাণ সঞ্চার হ'ল যেন। এতক্ষণ তাঁকে মূর্তিমান নিয়ম ব'লে মনে হচ্ছিল। একটু সসম্ভ্রমে তিনি বললেন, মিস্টার বেল এই ছেলেটিকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ক'রে গেছেন। ব'লে গেছেন যে, প্ল্যান-ট্ল্যান ক'রে কিছু

হবে না, ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে একটা কিছু আপনিই ঘ'টে উঠবে। আমি তাই একে বলছিলাম যে, ঘূর্ণাবর্তও বিশৃঙ্খল ব্যাপার নয়, তাও বিশেষ বিশেষ বাঁধা-ধরা নিয়মের অধীন। সেই নিয়মগুলো আগে থাকতে জেনে নিয়ে যদি ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করা যায়, তা হ'লে সুবিধাই হয়, ফলাফল আগে থাকতে আন্দাজ করা যায়। এবং সেটা সম্ভব। সেই সূত্রেই আপনার কথা উঠেছিল। আমার মনে হয়, আপনার প্রত্যেকটি কাজ আপনি বেশ প্ল্যান ক'রে করেছেন। আপনার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে কল্পনার এমন জুৎসই যোগাযোগ দেখলে মনে হয় যে, অনেক ভেবে-চিন্তে করেছেন সব। তাই এত করা সম্ভবও হয়েছে আপনার পক্ষে—নয়?

ম্যাক্স্ওয়েলের কণ্ঠস্বর শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে উঠল।

এডিসন হেসে বললেন, আমার কি মনে হয় জান, গার্ডের হাতের চড় খেয়ে সেই যে আমি কালা হয়ে গেলাম, তাই আমার উন্নতির কারণ। তার পর যতদিন বেঁচে ছিলাম, বাইরের কিছু শুনতে পেতাম না, একাগ্র হবার সুযোগ পেয়েছিলাম…

দেখা গেল, ম্যাক্স্ওয়েল এডিসনের জীবনের এ ঘটনাটা জানতেন না। চড় মেরেছিল? আপনাকে? কোন্ গার্ড? কেন?…

রেলের গার্ড। ও, তুমি জান না বুঝি? গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রেলে আমি একটা খবরের কাগজ ছেপে বিক্রি করতাম। অবসর-সময়ে সেই ট্রেনেই সময় কাটাতাম কেমিস্ট্রির এক্স্পেরিমেণ্ট ক'রে। একদিন একটা ফস্ফরাসের জার প'ড়ে গিয়ে ট্রেনে লেগে গেল আগুন। গার্ড ট্রেন থামিয়ে কানের উপর প্রচণ্ড একটি চপেটাঘাত ক'রে দূর ক'রে দিলে আমায়। কানের ড্রাম্‌টি ফেটে কালা হয়ে গেলাম জন্মের মত। এখন অবশ্য শুনতে পাই, কারণ সে দেহটা তো এখন আর নেই। একটু

হাসলেন, তার পর বললেন, এটা অবশ্য ঠিক যে, সত্যের প্রতি একাগ্র না হ'লে সে ধরা দেয় না কিছুতে। বধির হয়েছিলাম ব'লেই একাগ্রতা বেড়েছিল, অন্যমনস্ক হবার সুযোগ ছিল না। আমার বধিরতার কারণ গার্ডের চপেটাঘাত, তার কারণ ফস্‌ফরাসের জার প'ড়ে যাওয়া, তার কারণ বোধ হয় ট্রেনের ঝাঁকানি এবং আমার অসাবধানতা—কোন্‌টা যে আসল কারণ তা কি ক'রে বলি, বল?—দুষ্টুমি-ভরা হাসিতে চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

আসল কারণ অবসর-সময়ে আপনার কেমিস্ট্রি অধ্যয়নের আগ্রহ।—সসম্ভ্রমে বললেন ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল।

এডিসন চুপ ক'রে রইলেন স্মিতমুখে। তার পর বললেন, হ্যাঁ, সত্যকে জানবার আগ্রহটাই আসল জিনিস। সেই আগ্রহই নানা জনকে নানা নিয়মে নিয়ন্ত্রিত ক'রে···

এডিসনের মুখে "নিয়ন্ত্রিত" কথাটা শুনে ম্যাক্‌স্‌ওয়েল পুলকিত হয়ে উঠলেন। অংশুমানের দিকে চেয়ে বললেন, শুনলে? নিয়ন্ত্রিত না হয়ে উপায় নেই। নিয়মই সত্য সত্যই নিয়ম। এ কথা মনে রাখলে মনে জোর পাবে। অনিয়ম সত্য নয়, বিশৃঙ্খলা শৃঙ্খলারই মিথ্যা রূপ। সত্য নিয়মের পরাধীনতাই সত্য স্বাধীনতা। সত্যকেই আঁকড়ে থাক এবং কি ক'রে তা পারবে তার উপায় চিন্তা কর প্রতি মুহূর্তে। এরই নাম প্ল্যান···

হঠাৎ জেলের পাগলা ঘণ্টাটা বেজে উঠল। সাড়া প'ড়ে গেল চতুর্দিকে।

মারো—মারো—মারো···

ওপর-ওলার হুকুমে কংগ্রেসী কয়েদীদের মারা হচ্ছে ঘরে ঢুকে ঢুকে। আর্তনাদ উঠতে লাগল অন্ধকার ভেদ ক'রে। অংশুমানের ঘরের কপাটটা খুলে গেল। ব্যাটন হাতে ঢুকল পুলিস।

১৩

নিজের বৈঠকখানায় লাহিড়ী মশাই চিন্তিত মুখে তামাক টানছিলেন। ছেলের চাকরির জন্য যে দরখাস্তটি করেছিলেন, তা নামঞ্জুর হয়েছে। অনেক তদ্বির করেছিলেন, তবু হ'ল না। আপিসের বড়বাবু তাঁর বন্ধু, তাঁরই থ্রু দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন। একটু আগে বড়বাবু নিজে এসে ব'লে গেলেন—না হওয়ার আসল কারণ, সায়েব টের পেয়েছে অংশুমানের সঙ্গে ছেলের বন্ধুত্ব ছিল। ছিল, অস্বীকার করবার উপায় নেই। হতভাগা ছোঁড়াটা পাড়াসুদ্ধ সবাইকে মজিয়ে গেছে। আঃ! চাকরি তো হ'লই না, এখন পুলিসে না ধরলে বাঁচি। পেন্‌শনটি সম্বল, সেটা বন্ধ ক'রে দিলেই—বাস্! হুঁকোয় ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন, ধূমাচ্ছন্ন হয়ে গেল চারিপাশ, রগের শিরগুলো ফুলে উঠল, চোখ দুটো মনে হ'ল ঠিকরে বেরিয়ে আসবে এখুনি। বন্ধু পীতাম্বর প্রবেশ করলেন। গেঁটে-বাতওলা পাকা বুড়ো।

ওহে, খবর শুনেছ ?

কিসের খবর ?

রামতারণের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ প্রায় পাকা ক'রে এনেছিলাম, কিন্তু হ'ল না।

কেন ?

রামতারণের মেয়েই বেঁকে দাঁড়িয়েছে। বলছে, পুলিসের দারোগাকে বিয়ে করব না।

অ্যাঁ, বল কি ?

হ্যাঁ হে। অতি ভয়ঙ্কর কাল এসে পড়ল, বোয়েছ ?

খোঁড়াচ্ছ কেন ?

হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে। কদিন থেকে সমানে পূবে হাওয়া যা চালিয়েছে! ভাবলাম, ব'সে ব'সে কি আর করি, লাহিড়ীর সঙ্গে একদান পাশা খেলে আসা যাক। তামাক রাখ, পাশাটা পাড়।

লাহিড়ী পাশা পাড়লেন। গোমড়া মুখ ক'রে দুজনে পাশা খেলতে লাগলেন। বাড়ির সামনে একটা গাছে অজস্র জবাফুল ফুটে ছিল, তারাই হাসতে লাগল কেবল।

১৪

একটা মাসিক-পত্র টেবিলের উপর প'ড়ে ছিল। মলাটের উপরই প্রকাণ্ড একটা সাবানের বিজ্ঞাপন। একটি নারী তার প্রস্ফুটিত যৌবনকে লীলায়িত ক'রে আবক্র ভঙ্গীতে ব'সে আছে। নীচে রবীন্দ্রনাথের দু লাইন কবিতা। অস্তরা কাগজটা হাতে ক'রে ছবিটার দিকে চেয়ে ব'সে ছিল চুপ ক'রে। চেয়ে ব'সে ছিল দেখছিল না। যখন দেখল, তখন সারা মন বিরক্তিতে ভ'রে উঠল। নারীদেহের এই মাংসপিণ্ডগুলোকে যে কোন অজুহাতে যখন-তখন সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে লজ্জাও ক'রে না! পুরুষদের হয়তো করে না, তারা ওই হয়তো লুব্ধ-দৃষ্টিতে দেখতে চায়; কিন্তু মেয়েদেরও কি করে না? করে না বোধ হয়। কই, এ বিষয়ে কোনও নারীর প্রতিবাদ তো চোখে পড়ে নি আজ পর্যন্ত! তারা বোধ হয় এর সমর্থনই করে। করাই স্বাভাবিক, ব্যবসাদার যেমন তার মাল বিজ্ঞাপিত করতে চায়··· ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল অস্তরার। তাড়াতাড়ি মাসিক-পত্রিকার পাতাগুলো গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত উলটে গেল একবার। আবার শেষ থেকে গোড়া পর্যন্ত। তার পর বিতৃষ্ণাভরে সরিয়ে রেখে দিলে

সেটা। সন্ত-আসা মাসিক-পত্রের মোড়কটা প'ড়ে ছিল সামনে, সেটাকে অকারণে কুচিকুচি করলে অনেকক্ষণ ধ'রে। প্রত্যেকটি কুচি পাকিয়ে পাকিয়ে লুফল খানিকক্ষণ। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তার পর। চুলটা একটু ঠিক ক'রে নিলে। হঠাৎ নজরে পড়ল, ডান কানের দুলটা এখনও বেঁকে আছে একটু···স্যাকরাটা ঠিকমত জুড়তে পারে নি···দুলটা কেন ছিঁড়েছিল অনিবার্যভাবে সে কথাটাও মনে পড়ল। কিন্তু সেটাকে সে আমল দিলে না কিছুতেই, জোর ক'রে সরিয়ে দিলে মন থেকে। ও কথা নয়, সে অন্য কথা ভাবতে চায়, অন্য কিছু, যা হোক কিছু। একটা কথা মনে পডাতে সে বেঁচে গেল।

রামধন!

আজ্ঞে?

ভৃত্য রামধন দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হ'ল।

কই, বাজারের হিসেবটা দিলে না?

এই যে মা, নিন না। চার আনার আলু এনেছি, দু পয়সার সিম, আর আধ সের বেগুন তিন আনার···

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব নিতে লাগল অন্তরা প্রত্যেকটি জিনিসের দর ক'রে, প্রত্যেকটি জিনিস ওজন ক'রে। অবাক হয়ে গেল রামধন। কোনদিন তো এমন করেন না, আজ হ'ল কি! তার আত্মসম্মান আহত হ'ল একটু, কিন্তু কি বলবে! পুলকিতও হ'ল, যখন হিসেবে কোন খুঁত ধরতে না পেরে বকশিশ পেলে চার আনা। মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কাঠের টুকরোটাকে তুচ্ছ জেনেও প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে চায়, রামধন-প্রসঙ্গটাও তেমনই কিছুতে শেষ হতে দিতে চাইছিল না অন্তরা।

লাক্স সাবান বড় প্যাকেট পেলে না একেবারে? বাবুর নাম করেছিলে?

বাবুর নাম করলে ছোট প্যাকেটও পাওয়া যেত না মা। কোনও 'অপসর'কে কোন জিনিস দিতে চায় নাকি সহজে আজকাল! যেটুকু দেয় দায়ে প'ড়ে। আমাদের দেখলেই সরিয়ে ফেলে সব, বলে—বিক্রি হয়ে গেছে। হরিয়াকে দিয়ে কিনিয়েছি এটা...

হরিয়া স্থানীয় শশীবাবুর চাকর। শশীবাবু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। সরকারী ডেপুটি নন। কথাটা ব'লেই রামধন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। তখনই সামলে নিয়ে বললে, আমাদের বাবুকে তবু ভালবাসে অনেকে, তাই আমরা কিছু কিছু পাই। এস.ডি.ও. সাহেবের চাপরাসীকে দেখলে তো—। রামধন ভ্রূযুগল উত্তোলন ক'রে প্রকাশ করলে বাকিটা। এই সামান্য কথার ধাক্কায় অন্তরা ছিটকে গিয়ে পড়েছিল, যেখানে তা লক্ষ অপমানের তীক্ষ্ণ কণ্টকে সমাকীর্ণ,—বহু কাঁটা একসঙ্গে বিঁধল সর্বাঙ্গে। অন্তরার মুখের পেশী কিন্তু বিচলিত হ'ল না একটু। অমানুষিক শক্তিবলে কণ্ঠস্বরে অনাবশ্যক আবদারের সুর ঢেলে সে বললে, একটু গরম জল কর না তা হ'লে লক্ষ্মীটি। সিল্কের শাড়ি একখানা কাচতে হবে। রামধন চ'লে গেল গরম জল করতে। নূতন একটা সমস্যা সৃষ্ট হওয়াতে খুশি হ'ল অন্তরা। কোন্ শাড়িটা কাচতে হবে, সেটা নির্বাচন করা যাক এবার...একটাও ময়লা হয় নি তেমন...তবু বেছে বার করতে হবে একটা। সময় কাটবে।...

...ছোট একটি ঘর। জানলা নেই। ছোট ছোট ঘুলঘুলি। তাও লোহার জাল দেওয়া। কপাট বন্ধ। লোহার গরাদে দেওয়া মজবুত কপাট...সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে...অন্ধকার ঘরে একা চুপ ক'রে ব'সে আছে সে...মুখময় গোঁফদাড়ি, পরনে কয়েদীর পোশাক। চোখ দুটো জ্বলছে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা...

মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন?—কথাগুলো উচ্চারণ ক'রেই অন্তরা আত্মস্থ

হ'ল। শাড়ির স্তূপ সামনে রেখে কি ছবি সে দেখছিল এতক্ষণ! হঠাৎ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখলে কেন? জেলে মারধোব করছে নাকি? কই, কোন খবর তো পাই নি! তবে? স্পষ্ট দেখতে পেলে! কেমন ক'রে? ক্লেয়ারভয়েন্স? না, ওসব গাঁজাখুরিতে বিশ্বাস নেই তার। শাড়ির দিকে মন দিতে চেষ্টা করলে আবার। দুরন্ত বন্যা! তবু বাঁধ দিতেই হবে একটা যেমন ক'রে হোক। ভেসে যেতে হবে তা না হ'লে অকূলে। ভয় করে···। সমাজের ভয় নয়, গুরুজনের ভয় নয়, কেমন একটা নামহীন ভয়। গ'ড়ে-তোলা পারিপার্শ্বিককে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে অভ্যস্ত জীবনকে বিপর্যস্ত ক'রে দিয়ে কোথায যাবে সে অনিশ্চিত কোন্ পথে! ভয় বাইরে নয়, নিজের মধ্যেই। নীড়বিলাসী অন্তরাত্মা ঝঞ্ঝার আভাস পেলেই পক্ষ সঙ্কুচিত ক'রে চোখ বুজে ব'সে থাকতে চায় নীড়ের মধ্যে, তা যত তুচ্ছ হোক না সে নীড়। নিশ্চিন্ত আরামই তার কাম্য। এমন কি পরাধীনতার আরামও। পরাধীনতার আরামও চায় সে? বেণী-দোলানো এক কিশোরী গ্রীবাভঙ্গী ক'রে ব'লে উঠল মনের মধ্যে, কক্‌খনো নয়। অনাবিল স্বাধীনতায় পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মধ্যে যে আরাম, তাই চাই আমি। সে স্বাধীনতা কোথায়, সে মনুষ্যত্বেব অর্থ কি, খুঁজে বার কর সেটা। ঝুটো জিনিসও কখনও চাই নি, কখনও নেব না ···বেণী-দোলানো কিশোরীটির দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অন্তরা। তার নিজেরই পূর্বরূপ···বয়ঃসন্ধির সেই অপরূপ ছবিটা এখনও মরে নি নাকি···এখনও বেঁচে আছে অবুঝটা! কোন্ স্বপ্নলোকে? সহসা মনে হ'ল, ওই সত্য, স্বপ্নই সত্য। বাকি সব মিথ্যা। স্বাধীনতা কি···মনুষ্যত্ব কি?

অতীতের দিনগুলো এলোমেলোভাবে মনে পড়ল। মা-বাবা ভাই-বোন জামা-কাপড় ফ্রক-ব্লাউজ টেপ-তেল চিরুনি-স্নো বই-খাতা

স্কুলমাস্টার-মাস্টারনী বান্ধব-বান্ধবী চিঠি-প্রেম—এই সমস্তকে কেন্দ্র ক'রে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তার সমস্ত সত্তা যে ছন্দে আবর্তিত হয়েছে, তা স্বাধীনতারই ছন্দ। নিজের মতে নিজের পছন্দ অনুসারে সব চেয়েছে সে। সব মানুষই তাই চায়। স্বাধীনতা মানেই মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব মানেই স্বাধীনতা। মানুষেব অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি এটা। শৈশব থেকেই মানুষ পার হতে চায় গণ্ডি, লঙ্ঘন করতে চায় বাধা, অমান্য কবতে চায় বারণ। এটা ক'রো না, ওখানে যেও না···অনাদি কাল থেকে হিতৈষী গুরুজনেরা বারণ করেছেন আর অনাদি কাল থেকে অবাধ্য শিশুরা তা অমান্য করেছে। দুষ্কর্ম করতেও তার প্রবৃত্তি। সে ঠেকে শেখে, ঠেকে শেখবাব স্বাধীনতাই সে চায়। তারই বাধা সে চূর্ণ করেছে যুগে যুগে, বাধা হিতকর হ'লেও চূর্ণ করেছে, চূর্ণ ক'রে মরেছে, তবু থামে নি। পুরাতনকে ওলটপালট ক'রে সে আধুনিক হতে চেয়েছে বারম্বাব। মানবজাতিব এই ইতিহাস। তার অসংখ্য কামনার অসংখ্য বাধাকে সে অপসরণ ক'রে চলেছে। প্রকৃতির নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা থাকে নি সে। শীতাতপের নির্যাতন সহ্য কবে নি, গৃহ নির্মাণ কবেছে, অগ্নি আবিষ্কার কবেছে, বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছে নিত্য নব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে। দূবত্বের বাধা, সময়েব বাধাও সরিয়েছে সে। আকাশ-যান, বেতার-বার্তা, অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ···মানবসভ্যতার প্রগতি বাধা-অপসারণের ইতিহাস। মানুষ এও আবিষ্কার করেছে যে, আসল বন্ধন বাইরে নয, কঠিনতম বন্ধন নিজেরই মধ্যে,—ষড় রিপুর বন্ধন। তাও ছিন্ন ক'রে মানুষ মুক্ত হতে চেয়েছে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে। সে মুক্তি চায়, স্বাধীনতা চায়,—স্বাধীনতাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ।···মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা কেন দেখলাম···স্বাধীনতা-চিন্তার স্রোতকে ব্যাহত ক'রে প্রশ্নটা মনে জাগল আবার···

মা, গরম জল হয়ে গেছে।

খুব বেশি গরম কর নি তো? চল, দেখি।

সাড়ম্বরে শাড়িটা সাবান দিয়ে ভিজিয়ে দিতে লাগল।

…ভয় করে…হ্যাঁ, ভয় করে সত্যিই। কিন্তু ভয়ের সঙ্গে কৌতূহলও কি নেই? অতল গহ্বরটার দিকে চকিতে একবার চেয়ে দেখলে…

…ঘূর্ণিপাকের তাণ্ডব চলেছে ওর তলায়…সমুদ্র-মন্থন…ওর মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে কৌতূহল হয় বইকি…আত্মঘাতী কৌতূহল…

পিপারমিণ্ট আছে আপনার কাছে?

মুন্সেফবাবুর দশ বছরের মেয়ে রেখা এসেছে। ছিমছাম পোশাক-পরা মেয়েটি। মাথার চুল বব করা। এর মধ্যেই চোখের দৃষ্টিতে বয়সের ছাপ লেগেছে। সরলতা নেই। কথায় কথায় চোখ নীচু করে…

পিপারমিণ্ট? আছে বোধ হয়। দাঁড়াও, দেখি।

সময় কাটাবার আর একটা অজুহাত পেয়ে বেঁচে গেল। তন্নতন্ন ক'রে আলমারিটা খুঁজলে নিপুণভাবে, তার পর এ কৌটো সে কৌটো, এ তাক সে তাক…অনেকক্ষণ পরে পাওয়া গেল শেষকালে।

বেশি নয়, একটুখানি আছে।

ওমা, তুমি এক জায়গায় দাঁড়িয়েই আছ সেই থেকে?

মেয়েটি কিছু না ব'লে চোখ দুটি নীচু করলে শুধু।

কি হবে পিপারমিণ্ট?

মা পান দিয়ে খাবে।

মৃদুস্বরে কথা কটি ব'লে পিপারমিণ্ট নিয়ে চ'লে গেল মেয়েটি।

অন্তরা আর একবার বসল টেবিলে। আর একবার মাসিক-

পত্রখানা ওলটালে। গল্প পড়বার চেষ্টা করলে একটা। বিস্বাদ। কবিতা আরও বিস্বাদ।···উঠে দাঁড়াল। জানলার শার্শির একটা ফাটা কাচ জোড়া হয়েছিল পুরোনো চিঠি দিয়ে। সেইটে পড়ল খানিকক্ষণ ঘাড় বেঁকিয়ে।···দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ার চিঠি···বিধবা···চেহারাটা মনে পড়ল···গোলগাল ফরসা বেঁটে হাসিখুশি মানুষটি। নিজের দুর্ভাগ্যকে অতি সহজভাবে মেনে নিয়ে ঠেলে সরিয়ে রেখেছেন সেটাকে, তা দিয়ে জীবনের স্রোতকে অবরুদ্ধ করেন নি···আনন্দের ধারা বইছে অবারিত-ভাবে, চোখে মুখে কথায় হাসিতে উপচে পড়ছে তা, অথচ কোনও আতিশয্য নেই, সহজ সুন্দর আনন্দ। "জীবন" বলতে পাশ্চাত্য ধরনে আমরা যে পশুজীবন বুঝি, তার কোন আস্ফালন নেই। সেটা প্রায় নিশ্চিহ্ন। এক বেলা আহার, পরনে থান, কখন ঘুমোন কখন জাগেন—কেউ জানতে পারে না, মৈথুনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকেই গেছে, ও-কথা ভাবেও না বোধ হয়। আধুনিক অর্থে শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা মোটেই নেই, একেবারে নিরক্ষর। আধুনিক মাপকাঠিতে এত ছোট যে মানুষটি, সে কিন্তু যেখানে থাকে সেখানটা পরিপূর্ণ ক'রে রাখে, সুরভিত হয়ে ওঠে চারিদিক। আধুনিকামনা অস্তরা দূর-সম্পর্কের এই দুর্গাদিদির সঙ্গ পাবার জন্যে লোলুপ হয়ে উঠল মনে মনে। দুর্গাদিদিকে কাছে পেলে সব কথা খুলে বলা যেত হয়তো, তিনি হয়তো বুঝতেন তার কথা। কোথায় আছেন এখন···অনেক দিন আগে এসেছিলেন একবার···ফিরে গিয়ে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন, মানে লিখিয়েছিলেন পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়ে···উত্তর দেওয়া হয় নি।···কাটা কাচের সবটা জোড়া যায় নি কাগজ দিয়ে · চিড়-খাওয়া খানিকটা অংশে সূর্যালোকে রঙ ধরেছে···গৈরিক রেখায় পাশে অতি-সরু রক্তের আভাস কাঁপছে থরথর ক'রে···বাইরে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর···

অগ্নি

ভারতবর্ষের নির্ভীক আত্মার সত্য-রূপটি ওরই মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। তর্কের বিষয় নয়, জানি। অনুভব করছি। হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট-নেকটাই-পরা বিদেশী-বুলি-মুখস্থ-করা চাকরের দল ভারতে জন্মেছে ব'লেই কি ভারতীয় ওরা? তিলক-ফোঁটা কেটে টিকি-নামাবলী উড়িয়ে সংস্কৃত মুখস্থ বুলি আওড়াচ্ছে যে আর এক-জাতীয় তোতাপাখির দল, তারাই কি ভারতীয়? জাতীয়তার অভিনয় ক'রে বিজাতীয় বুলি আওড়াচ্ছে যারা, তারাই কি? কিছুই করছে না যারা—অন্ধ মূঢ় জনতার দল, যাদের দুঃখে আমরা অহরহ অভিভূত হয়ে বক্তৃতা-বিলাসের মাত্রা বাড়িয়েই চলেছি ক্রমাগত, ওই যে শত-করা নিরেনব্বই জন, যারা জন্মাচ্ছে আর মরছে ক্ষুধায় হাহাকার ক'রে লোভে লালায়িত হয়ে রোগে ভুগে ভুগে, যে কোন বক্তার বক্তৃতায় উত্তেজিত হচ্ছে, পুলিসের হুমকিতে পালাচ্ছে, কাবুলীর কাছে ধার করছে, তাড়িখানায় হাল্লা করছে, তারা সংখ্যাতে বেশি ব'লেই কি ভারতীয় নামের যোগ্য? না। আর্য বৌদ্ধ মুসলমান ক্রিশ্চান সভ্যতার বহুবিধ বিপর্যয়েও বিভ্রান্ত হয় নি যে ভারতীয় আত্মা, তার স্বরূপ কেবল ওরই মধ্যে ফুটেছে, অম্বরার মনে হ'ল। ওই চিড-খাওয়া কাচের মধ্যে সূর্যালোকের মত, ভেঙেছে কিন্তু মরে নি, রূপান্তরিত হয়েছে ইন্দ্র-ধনুতে। পুলিসের ব্যাটনে মাথা ফাটতে পারে, কিন্তু সেই ফাটল বেয়ে যা বেরুবে তা রক্ত নয়—লাভা-স্রোত, বহু শতাব্দীর সঞ্চিত নিরুদ্ধ উত্তাপ…চিড-খাওয়া কাচের ফাটলে ওই ক্ষীণ রক্তের আভাসে ভেসে ভেসে এসেছে, যেমন আসে জ্বলন্ত সূর্যের বার্তা কোটি মাইল দূর থেকে।

গাড়িটা এসে কাছারিতে যখন দাঁড়াল, তখন অম্বরা যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। আদালতের বিবিধ বৈচিত্র্য হঠাৎ যেন একটি ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হ'ল সহসা, তার মুখের দিকে চেয়ে রইল সবিস্ময়ে

নির্নিমেষে। নীরব প্রশ্নও একটা মূর্ত হয়ে উঠল সে দৃষ্টিতে—তুমি এখানে হঠাৎ? আস না তো কোনদিন!

চাকরকে দিয়ে গাড়ি ডাকিয়ে সে যখন তাতে চ'ড়ে বসেছিল, তখন সে যেন অন্য লোকে ছিল, এ অদ্ভুত আচরণের অস্বাভাবিকতা তখন চোখে পড়ে নি তার। গাড়ি ডাকিয়ে অবিলম্বে আদালত অভিমুখে রওনা হয়ে পড়াটাই বরং সঙ্গত মনে হয়েছিল তখন। ওই অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও তো খবর পাওয়া সম্ভব নয়। এখন সহসা সে উপলব্ধি করলে, জবাবদিহি করতে হবে একটা। জবাবদিহি না করলে···কিন্তু কি বলবে? মিছে কথা বানিয়ে বলতে হবে একটা? কিন্তু কি বলবে?···মাথায় কিছু এল না; অসহায়ভাবে জনতার দিকে চেয়ে ব'সে রইল সে। যে ঘরটায় তার স্বামীর আদালত, তার সামনে খুব ভিড়···

"রামু মণ্ডল হাজির হো—"

চিৎকার ক'রে উঠল আরদালী।

বিচার হচ্ছে। তার স্বামী বিচারক।

তার সমস্ত মুখ নীরব হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। বহু দূরের বহু যুগ পরের অনাগত ভবিষ্যতের একটা স্বপ্ন···সেখানে তার বিচারক স্বামী নেই। অংশুমান? কই, সেও সেখানে নেই। জনতার মধ্যে নেই, নির্বাচিত সুধীদের মধ্যেও নেই। কোথায় সে?···বিরাট বিশাল দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্র একটা, কুচকুচে কালো জল, তার মধ্যে একটা লাল দ্বীপ·· প্রবাল নয়, জমাট রক্ত···বহু যুগের প্রচুর রক্ত জ'মে কঠিন হয়ে গেছে, কিন্তু কালো হয় নি, টকটকে লাল আছে এখনও। সেই দ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছে অংশুমান একা···মৃত রক্তকণিকাদের জাগাতে চেষ্টা করছে, ভাবছে, তারা না জাগলে তো সবই বৃথা···

এ কি, বউদি, আপনি এখানে ?

নবীন উকিল একটি। ভাব হয়েছে ছেলেটির সঙ্গে কিছুদিন থেকে তার স্বামীর। কমিউনিজ্‌মে আস্থাবান, ভাল ব্রিজ-খেলোয়াড়, মিহি খোশামোদও করতে পারে।

বাজারে যাচ্ছি।

এত ঘুরে ?

বীণাদের বাড়িও যাব।

ঠিক সময়ে মিথ্যে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়াতে সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল। একটু আগেও মনে পড়ে নি যে, বীণাদের বাড়িটা কাছারির সামনেই। বীণারা সেদিন এসেছিল, গেলেও বেমানান হবে না। কিন্তু সে যাবে না। অজুহাতটা খাড়া করতে পেরে স্বস্তি অনুভব করলে একটু।

বীণারা আজ কলকাতা গেছে সকালের ট্রেনে—

ও, তাই নাকি ?

একটু ঝুঁকে গাড়োয়ানকে বললে, তবে বাজারে চল।

গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করেছে, তখন দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হঠাৎ অনিবার্য প্রশ্নটা সে ক'রে বসল, আচ্ছা, জেলে নাকি মারধোর করছে ?

আপনি কোথা থেকে শুনলেন ?

কে যেন বলছিল।

খবর তা হ'লে র'টে গেছে! ওসব খবর কি চাপা থাকে কখনও ?

সত্যি তা হ'লে ?

উকিল মানুষ, কথায় কিছু বললেন না, কিন্তু মুচকি হাসিতে যা

প্রকাশ করলেন তা কথার চেয়েও স্পষ্টতর। বন্দী হৃৎপিণ্ডটা অনেকক্ষণ থেকেই পঞ্জরকারায় মাথা কুটছিল, হঠাৎ সেটা স্তব্ধ হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্য।

মফস্বল শহরের বন্ধুর পথে ধুলো উড়িয়ে চলেছে ছ্যাকড়া গাড়িটা। অসাড় অবসন্ন দেহে ব'সে আছে অস্তরা। মন কিন্তু উড়ে চলেছে ঝ'ড়ো হাওয়ার মুখে হালকা মেঘের টুকরোর মত···অদৃষ্ট অতীত থেকে অদৃশ্য ভবিষ্যতের দিকে···

অনেকক্ষণ পরে সামনে এলোমেলো নানা জিনিসের স্তূপ দেখে বিস্মিত হ'ল সে একটু। এগুলো·· তখনই মনে পড়ল, নিজেই সে কিনেছে এগুলো বাজারে ঘুরে ঘুরে। ফিতে, চিরুনি, তেল, সাবান, টফি, চায়ের পেয়ালা। খদ্দরের টুকরোটাও চোখে পড়ল। এ বাড়ির কেউ পরবে না জেনেও এটা সে কিনেছে। ওই খদ্দরটুকুকেই বার বার তুলে সযত্নে পাট করতে লাগল সে। ওই খদ্দরের টুকরোর মধ্যেই তার স্পর্শ যেন সে খুঁজতে লাগল। ধরবার মত হাতের কাছে আর তো কিছু নেই···

···অপরাহ্ণ। পড়ন্ত রোদের একফালি এসে ঢুকেছে জানলার ভিতর দিয়ে। পড়েছে তার কোলের উপর। জানলার ধারে চুপ ক'রে ব'সে আছে অস্তরা বাইরের দিকে চেয়ে। বড় একা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, চিরকালই সে একা। জীবনে ভিড় জুটেছে, সঙ্গী জোটে নি কখনও। বিশাল সমুদ্রে তৈলকণিকার মত তরঙ্গের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হচ্ছে সে কেবল, মিশ খায় নি। সারা জীবন তবু ভান করতে হচ্ছে। নিজের কাছেও। আশেপাশে কেউ নেই। দূর থেকে লোকে

দেখে, একটি তারার ঠিক পাশেই আর একটি তারা।…কিন্তু দুটি তারার মাঝে কোটি কোটি যোজনের ব্যবধান। ঠিক পাশে কেউ নেই—শুধু শূন্যতা…

১৫

নীহার সেন ডেপুটি হয়েছে ব'লেই যে মত বদলেছে, তা নয়। এখনও সে মনে প্রাণে কমিউনিস্টই আছে। ক্যাপিটালিস্টদের অধীনে চাকরি নিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। পেটের দায়ে, সংসারের চাপে। পারিপার্শ্বিককে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলই তো জীবনযাপনের বিজ্ঞান এবং আর্ট। জীবনটা যখন যুদ্ধ, তখন কখনও আক্রমণ, কখনও সন্ধি, কখনও আপোস, কখনও বিরোধ—এ তো হবেই। উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেই হ'ল। উদ্দেশ্য তার ঠিক আছে। তা ছাড়া এখন…ঠিক এই মুহূর্তে ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের সঙ্গে বিরোধিতার কোন হেতু নেই। ক্যাপিটালিস্ট ব্রিটিশ এখন অ্যাণ্টি-ফাসিস্ট…চার্চিলকে হাত মেলাতে হয়েছে স্টালিনের সঙ্গে। হাত মিলিয়েছে যখন, তখন ঝগড়া নেই আর আপাতত। চাকরি নেওয়ারও কোন বাধা নেই। শুধু তাই নয়, ঠিক এই মুহূর্তে ব্রিটিশ শাসন-বিভাগে চাকরি নেওয়াটা প্রয়োজনও। আগস্ট-ডিস্টার্বেন্সের অর্থ তো পরিষ্কার! ফাসিস্ট জাপানকে আমন্ত্রণ। সেটা যে মারাত্মক। এ মূঢ়তাকে প্রতিরোধ করতেই হবে সুতরাং যেমন ক'রে হোক। আপাতদৃষ্টিতে যতই রূঢ় হোক তার আচরণ, যতই কঠোর হোক সমালোচনা (তথাকথিত অর্ধশিক্ষিত সংকীর্ণদৃষ্টি স্বদেশভক্তদের ফেনায়িত উচ্ছ্বাসের ধার ধারে না সে), দেশের মঙ্গলের জন্যই এসব দৃষ্টিকটু ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে হবে এখন…

রোগীর মঙ্গলের জন্য যেমন তার ফোড়াটায় ছুরি চালাতে হয়, তেমনই জনতার উপর গুলি চালানোই দরকার এখন জনতার মঙ্গলের জন্যে। লোকে যাই বলুক, দেশের এ অবস্থায় স্যাবটেজ মারাত্মক, যেমন ক'রেই হোক দমন করতে হবে।

নীহারবাবু বাইরের ঘরে একা ব'সে ফাইল ক্লিয়ার করতে করতে চিন্তা করছিলেন। আজকাল যখনই একা থাকেন, এই চিন্তাটা তাঁকে পেয়ে বসে। প্রতিপক্ষ কেউ নেই, তবু মনে মনে তর্ক করতে হয়। একা পেলেই চিন্তাটা চুপিচুপি চোরের মত এসে মনের মধ্যে ঢোকে, তর্ক জুড়ে দেয়,···কিছুতেই এড়াতে পারেন না।

দমন করতেই হবে যেমন ক'রে হোক।—আর একবার মনে মনে আওড়ালেন নীহার সেন। আউড়েই ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। দ্বিজেন চক্রবর্তীকে দেখা গেল দ্বারপ্রান্তে।···লোকটা কতক্ষণ এখন বকবক করবে কে জানে! পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর, তা ছাড়া একসঙ্গে প'ড়েও ছিলেন কলেজে। সুতরাং তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না সহজে।

কি হচ্ছে? ফাইল ক্লিয়ার? তোমরা খাসা আছ! আমাদের যে কি দুর্দশা···

কি রকম?—একটু কৌতূহল প্রকাশ করতেই হ'ল নীহার সেনকে।

পরশু দিনকার ঘটনাটাই ধর না। একটা নতুন থানায় বদলি হয়েছি, চার্জ নিতে না নিতেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জরুরি হুকুম—ওই এলাকায় মিলিটারি নিয়ে গিয়ে একটা গ্রাম খানাতল্লাসী করতে হবে। যারা রেল-লাইন উপড়েছিল, তারা নাকি সেখানে লুকিয়ে আছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুম অমান্য করবার উপায় নেই। স্টেশনে গেলাম। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাকে কম্যাণ্ডিং অফিসারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। সমস্ত ট্রেনখানাই মিলিটারি, মায় ড্রাইভার

পর্যন্ত। কম্যাণ্ডিং অফিসারই তার মালিক, কোথায় কখন থামাতে হবে তা ড্রাইভারকে বলা আছে আগে থাকতে। তাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠতে হ'ল। বি. এ. পাস করেছি তো, ইংরেজীতে নেহাত কাঁচাও ছিলাম না, কিন্তু ভাই, তাদের একটি কথাও বুঝতে পারি না প্রথমে। ঘুচঘাচ ক'রে কি যে বলে, বোঝাই যায় না কিছু। কথা বলে আর মাঝে মাঝে দাঁত খিঁচোয়। মুচকি হেসে ঘাড় নাড়ি শুধু। কি আর করব? একটু পরে বুঝতে পারলাম, গাল দিচ্ছে—আমাদের দেশের লোককে গাল দিচ্ছে। অকথ্য ভাষায়। সন অব এ বিচ, সন অব এ গান, নিগার্স্, ব্যাস্টার্ড্স্—এই সব হ'ল মৃদুতম। এই চলল খানিকক্ষণ। অনবরত সিগারেট টানছে, মদ মারছে, বিস্কুট চিবুচ্ছে আর আমাদের গাল দিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারবার পরও মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে যাই। উপায় কি? কোথায় ট্রেন থামাবে তা আমাকে বলবে না। যদিও আমি পুলিস তাদের সপক্ষে আছি, কিন্তু আমি কালা আদমী যে, আমাকে বিশ্বাস করবে কি ক'রে? একটা ম্যাপ খুলে নিজেই ঠিক করছে সব। কিছুক্ষণ পরে ট্রেনটা থেমে গেল হঠাৎ মাঠের মাঝখানে। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, দু দিকে মাঠ। সায়েব বললে, এইখানে নাবতে হবে। বললাম, এখানে? এখানে নেবে কি হবে, এখানে রাস্তা কোথা? সায়েব বললে, মাঠ ভেঙেই যাবে তারা। সারপ্রাইজ অ্যাটাক করতে হবে। ম্যাপ দেখে বললে, মাইল খানেক গেলেই নাকি সেই গ্রামে পৌছানো যায়। আমি ঠিক তার আগের দিন চার্জ নিয়েছি, কিচ্ছু চিনি না, কারও সঙ্গে পরিচয় পর্যন্ত হয় নি। আমার ঈষৎ ইতস্তত ভাব দেখে সায়েব রূঢ়কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, গেট ডাউন, গেট ডাউন প্লীজ অ্যাণ্ড লীড আস। নাবলাম, মানে নাবতে হ'ল। ভাগ্যে কাছে একটা টর্চ ছিল। তারই সাহায্যে কোন রকমে ছেঁচড়ে-

মেচড়ে তার টপকে মাঠে গিয়ে পড়লাম। আল ধ'রে ধ'রে আরও খানিকটা এগিয়ে দেখি, নালা রয়েছে একটা। সোল্‌জারগুলো গাড়ি থেকে নেবে সারবন্দী হয়ে দাঁড়াচ্ছে ততক্ষণ। আমি নালার একটা সরু অংশ দেখে লাফিয়ে পার হয়ে গেলাম, তার পর চেঁচিয়ে বললাম, কাম অন দেন। মাঠের মধ্যে নাবল সবাই, বেয়নেট উঁচিয়ে আল ভেঙেই ছুটতে লাগল ব্যাটারা। কিন্তু টর্চ ছিল না ব্যাটাদের, নালাটা দেখতে পায় নি, হুড়মুড় ক'রে পড়ল এসে তার মধ্যে। কিন্তু কিছু কি গ্রাহ্য করে ব্যাটারা! জল কাদা ভেঙে দেখতে দেখতে এপারে এসে উঠল সব। আমি ততক্ষণ ভেবে-চিন্তে উপায় বার ক'রে ফেলেছিলাম একটা, বুঝলে···

এতক্ষণে থামলেন দ্বিজেন চক্র। একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে থামেন না তিনি সহজে। এখনও থামতেন না, কিন্তু সিগারেট ধরাবার প্রয়োজন হয়েছিল। ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চন করা ছাড়া আর কোন উপায়ে বিরক্তি প্রকাশ করা নীহার সেনেরও সাধ্যাতীত, মার্জিতরুচি ভদ্রলোক তিনি। তাঁর কুঞ্চিত-ভ্রূ দ্বিজেনবাবু লক্ষ্যও করলেন না বোধ হয়। সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার শুরু করলেন তিনি—

উপায় একটা বার ক'রে ফেলেছিলাম, বুঝলে। কাছেই একটা বাগান ছিল, সম্ভবত আমবাগানই। সাহেবকে বললাম, তুমি তোমার সৈন্যদের নিয়ে এই বাগানে একটু অপেক্ষা কর, আমি দু-একজন লোক যোগাড় ক'রে নিয়ে আসি। আমি কালই এখানে বদলি হয়েছি, পথঘাট ভাল চিনি না, তা ছাড়া ভিতরের খবরটা প্রথমে একটু জানলে সুবিধেই হবে। তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি লোক যোগাড় ক'রে আনি। সাহেব সার্‌প্রাইজ অ্যাটাক করতে ব্যস্ত, তার এ সন্দেহও

হয়তো হ'ল যে, আমি বোধ হয় আসামীদের সতর্ক করাতে যাচ্ছি। অনেক কষ্টে তাকে বোঝালাম যে, আমরা সারপ্রাইজ অ্যাটাকই করব, কিন্তু এলোপাতাড়ি অ্যাটাক করলে অনর্থক একটা প্যানিক হবে, কাজ হবে না। বিভীষণ একটা যোগাড় করতে যদি পারি সুবিধে হবে। অনেক কষ্টে রাজী হ'ল লোকটা। আমি তাদের সেখানে রেখে বিভীষণ যোগাড় করতে বেরুলাম। সোজা খানিকক্ষণ হাঁটবার পর রাস্তায় একটা লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, থানা কোন্ দিকে? থানার রাস্তাই জানা ছিল না আমার। সে একটা রাস্তা বাতলে দিয়েই স'রে পড়ল, খাকী পোশাক দেখে সে আর বেশিক্ষণ কাছে থাকা নিরাপদ মনে করলে না। প্রায় মাইল দেড়েক হেঁটে থানায় পৌঁছলাম। আমি ঠিক তার আগের দিন চার্জ নিয়েছি। যিনি আমার জায়গায় ছিলেন, তাঁর সেই দিনই সন্ধ্যের ট্রেনে চ'লে যাবার কথা। গিয়ে দেখি, সবাই স্টেশনে গেছে তাঁকে সি-অফ করতে। থানা ভোঁ-ভাঁ। একটি লোক নেই। আমি ভেবেছিলাম, থানার কন্‌স্টেবলদের সাহায্যে যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করব। কিন্তু গিয়ে দেখি, জনপ্রাণী নেই। অনেক হাঁকাহাঁকির পর চৌকিদার বেরুল একটা। তাকেই সঙ্গে নিয়ে সেই গ্রামটার নাম ক'রে বললাম, চল্ ওই গ্রামেই 'রোঁদ' দেব আজ। তুই সঙ্গে থাক্ আমার। তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলাম। আবার মাইল দুই হণ্টন। গ্রামে পৌঁছে দেখি, একেবারে নিষুতি। কেউ জেগে নেই, এক কুকুরগুলো ছাড়া। তারাই ঘেউঘেউ ক'রে সম্বর্ধনা করলে এবং সর্বক্ষণ পিছনে লেগে রইল। চৌকিদারকে বললাম, ডেকে তোল্ একজন কাউকে। কাকে হুজুর? যাকে হোক। একটা কুঁড়েঘরের সামনে অনেক সোরগোল ক'রে একটা জীর্ণশীর্ণ লোককে টেনে তুললে সে। স্বয়ং দারোগা সাহেব

দ্বারদেশে সমুপস্থিত শুনে লোকটা তাড়াতাড়ি বেরুতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেল, তার পর উঠেই সেলাম ক'রে ফেললে একটা—

দ্বিজেন চক্রবর্তী হা-হা ক'রে হেসে উঠতেই নীহার সেন বুঝতে পারলেন, দ্বিজেন মদ খেয়েছেন। ভ্রূ আর একটু কুঞ্চিত হ'ল। দ্বিজেনের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। নীহার ভাবতে লাগলেন, আগে তো খেত না, ধরলে কবে ?

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আবার শুরু করলেন দ্বিজেনবাবু, সেলাম ক'রে লোকটা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল ফ্যালফ্যাল ক'রে। তার পর বার দুই ঢোঁক গিলে সসঙ্কোচে বললে, হুজুর ডেকেছেন আমাকে ? আমি বললাম, হ্যাঁ, চল্ আমার সঙ্গে। চৌকিদারকে বললাম, তুমি থানায় যাও, আমি আসছি একটু পরে। চৌকিদার থানার দিকে চ'লে গেল, আমি চলতে লাগলাম সেই আমবাগানের উদ্দেশে। এবার পলাশীর আমবাগান নয়, জাফরগঞ্জের আমবাগান। হা—হা—হা—

নেশাটা জ'মে এসেছিল দ্বিজেন চক্রবর্তীর। আবার একটা সিগারেট ধরালেন তিনি।

হনহন ক'রে চলতে লাগলাম। লোকটা কুকুরের মত পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল। এত রাত্রে কোথায় কি উদ্দেশ্যে নিয়ে চলেছি তাকে, তা জিজ্ঞেস করবার সাহস পর্যন্ত হ'ল না লোকটার। ভাগ্যে হয় নি···

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে আপন মনেই হাসলেন একটু মুখ নীচু ক'রে।

বাগানের অন্ধকারে বীর ব্রিটিশ সৈন্যরা বেয়নেট উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সারি সারি আমার প্রতীক্ষায়। সেখানে ঢুকে টর্চটা জাললাম দপ

ক'রে, বেয়নেটগুলো চকচক ক'রে উঠল। ক্যাপ্টেন সাহেব এগিয়ে এলেন। তাকে চুপি চুপি বললাম, লোক পেয়েছি একজন। তার পর সেই লোকটার দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি বাঁচতে চাও? ভয়ে কথা সরছিল না তার মুখে, হাত জোড় ক'রে থরথর ক'রে কাঁপছিল শুধু সে। ঠিক তার দুদিন আগে পার্শ্ববর্তী গ্রামে মিলিটারি রেড হয়ে গেছে। লোক মারা গেছে, ঘর পুড়েছে, নারীধর্ষণ হয়েছে। যারা পালাবার পালিয়েছে। নিতান্ত অপারগ যারা, তারাই আছে এখনও। এ লোকটা পরে শুনলাম, কালাজ্বররোগী। একে ফেলে পালিয়েছে সবাই। এর ছেলে কোথায় চাকরি করে, তার আশায় ভিটে আঁকড়ে প'ড়ে আছে ও। আমার "বাঁচতে চাও" প্রশ্নের উত্তরে অস্ফুটকণ্ঠে সে শুধু বললে, হুজুর মা-বাপ। আমি বললাম, দেখ বাপু, ওসব ব'লে কিছু লাভ নেই। যারা রেল-লাইন উপড়েছে, তাদের ঘর দেখিয়ে দিতে হবে—যদি দাও বাঁচবে, তা না হ'লে মৃত্যু। গুলি ক'রে এরা মেরে ফেলবে তোমাকে, কারও কথা শুনবে না। আমি কিছুই জানি না।—করুণকণ্ঠে বললে লোকটা। তা হ'লে মর। লোকটা চুপ ক'রে রইল। অশিক্ষিত বোকা লোক কিনা, মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও চুপ ক'রে রইল। আমি শিক্ষিত এবং চালাক, বুদ্ধি বাতলে দিলাম। বললাম, ওরে ব্যাটা, যে কোনও ঘর দেখিয়ে দে না, তা হ'লেই হবে, কেন বেঘোরে প্রাণটা হারাবি? ক্যাপ্টেন সাহেব অধীর হয়ে উঠছিলেন, আমাদের কথা একবর্ণ বুঝতে পারছিলেন না, গজরাচ্ছিলেন আর হাতঘড়ি দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি হিরোয়িক কাণ্ড ক'রে বসলেন একটা। আচমকা লোকটার গালে ঠাস ক'রে একটা চড় বসিয়ে দিলেন 'ব্লাডি সোয়াইন' ব'লে। লোকটা প'ড়ে গেল। তার পর উঠেই দৌড়। অন্ধকারে কোথায় সে স'রে পড়ল খুঁজে পেলাম না

আর। টমিগুলোও অনেক খোঁজাখুঁজি করলে, কিন্তু পাওয়া গেল না তাকে। ক্যাপ্টেন সাহেব ক্ষেপে উঠল, মনে হ'ল আমাকেই মেরে বসে বুঝি! বললাম, সাহেব, ঘাবড়াচ্ছ কেন? খবর যোগাড় ক'রে এনেছি, চল আমার সঙ্গে, এস। নিয়ে গেলাম। গিয়ে কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হ'ল। কয়েকটি বুড়ী আর রুগী ছাড়া গ্রামে আর কেউ নেই, সব পালিয়েছে। সশস্ত্র ব্রিটিশবাহিনী নিরস্ত হ'ল না তবু। রুগীগুলোকেই ঠ্যাঙাতে লাগল। মারের চোটে একটা ছোঁড়া রক্ত-বমি করতে শুরু করলে; শুনলাম, থাইসিস। একটা টমি একটা বুড়ীরই কেশাকর্ষণ করছে দেখলাম। অনেক কষ্টে থামাই তাদেব, শেষকালে তারা প্রত্যেকের ঘরে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ফেলে ছড়িয়ে সোনাদানা যা পেলে পকেটে পুরে ব্রিটিশ-প্রতাপের মর্যাদা রক্ষা করলে কতকটা। আর—

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গুম হয়ে ব'সে রইলেন কিছুক্ষণ দ্বিজেনবাবু।

নীহার সেনের কুঞ্চিত ভ্রূ মসৃণ হয় নি। মুখে ফুটেছিল মৃদু হাস্যরেখা। দ্বিজেনের সব কথা শুনছিলেন তিনি, কিন্তু বিচলিত হয়েছেন মনে হচ্ছিল না। স্থির জলাশয়ের জল যেন। ঊর্মির চাঞ্চল্যও নেই। সূর্যের আলো, মেঘের ছায়া, উড়ন্ত পাখির প্রতিবিম্ব, নক্ষত্রের দীপালী, জ্যোৎস্নার সমারোহ সবই জলে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু জলের জলত্ব নাশ করতে পারে না। ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ হবার পরও জল জলই থাকে। নীহারের প্রসারিত চেতনার উপর তেমনই দ্বিজেন চক্রবর্তীর বর্ণনাটা পরিস্ফুট হ'ল, কিন্তু রেখাপাত করল না। অনুরূপ একটা ছবি পাশাপাশি ফুটে উঠল বরং। তিনি নিজেই সে ঘটনার নায়ক। একটা গ্রামে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় করতে গিয়েছিলেন।

সে গ্রামে পোস্ট-অফিস থানা স্টেশন সব পুড়েছিল। ঘাটে একটা মালবোঝাই ফ্ল্যাট ছিল, সবাই লুট করেছিল সেটা। সুতরাং দশ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা অন্যায় হয় নি কিছু। দ্বিজেনের কথা শুনতে শুনতে সেই সম্পর্কে কয়েকটা মুখচ্ছবি পর পর ফুটে উঠল মনে। প্রায়ই ফুটে ওঠে। ভদ্রলোক সব। ডাক্তার জমিদার ব্যবসাদার সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ বেয়নেট-ধারী মিলিটারি পরিবৃত হয়ে সারিবদ্ধ ব'সে আছে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। ভীত, অসহায়। লুটপাট তারা করে নি তা ঠিক, কিন্তু টাকা তাদের দিতে হবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দিতে হবে। না দিলে সম্পত্তি নিলাম ক'রে নেওয়া হবে। গ্রাম্য ডাক্তারের দৃষ্টিটা মনে পড়ল, জ্বলছিল যেন। জমিদারের ম্যানেজারটা সেলাম ক'রে খোশামোদ করবার চেষ্টা করছিল। চতুর ব্যবসাদার ঘুষ দেবার প্রস্তাব করছিল আকারে ইঙ্গিতে। বৃদ্ধ গৃহস্থ বেচারা কাঁদছিল। নীহার সেন কিন্তু টলেন নি। পাই পয়সা পর্যন্ত আদায় ক'রে এনেছিলেন। এসব ব্যাপারে টললে চলে না। শেষ লক্ষ্য যদি মহৎ হয়, তা হ'লে সে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ছোটখাটো এমন অনেক কাজ করতে হয়, যা আপাতদৃষ্টিতে অমহৎ, কিন্তু শেষ লক্ষ্যের মাপকাঠিতে যাচাই করলে ইতিহাসের বিরাট পটভূমিকায় যা অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায় অবশেষে। লেনিন মানব-প্রেমিক ছিলেন, মনে মনে তিনি যে সমাজের কল্পনা করেছিলেন, তা প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু সেই সমাজকে বাস্তবে মূর্ত করতে গিয়ে নরহত্যায় পশ্চাৎপদ হন নি তিনি। হ'লে চলে না। লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে অসাধারণ মানুষের ওইখানেই তফাত।...দ্বিজেন চক্রবর্তীর কথা শুনতে শুনতে এই সব মনে হচ্ছিল নীহার সেনের। বিচলিত হন নি তিনি, বিচলিত হন নি মোটেই, বিচলিত হতে চান না।...সহসা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন,

মনে মনে চিৎকার করছেন তিনি। তাঁর নিজেরই সত্তাটা যেন দু ভাগ হয়ে গেছে, এক ভাগ আর এক ভাগের সঙ্গে তর্ক করছে চিৎকার ক'রে। চমকে উঠে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। তার পর দ্বিজেনের মুখের দিকে চাইলেন একবার আড়চোখে। মনে হ'ল, কিছু বলা উচিত।

কর্তব্য অনেক সময় কঠোর হয়ই, কি আর করা যাবে···

কর্তব্য? তাই নাকি! তোমার তো কর্তব্যপরায়ণ ব'লে নাম রটেছে খুব, তুমিও অনুভব করছ তা হ'লে! ভাল।

দ্বিজেনের মুখখানা হাস্যদীপ্ত হয়ে উঠল।

এইবার চুটিয়ে কর্তব্য করব ব্রাদার, বুঝলে। এতদিন ডালে ডালে ছিলাম, এবার পাতায় পাতায় বেড়াব। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া—কোথায় পড়েছিলাম বল তো? মরুক গে। মোট কথা, চুটিয়ে কর্তব্য করব এবার। প্রোমোশন হয়েছে, শুধু তাই নয়, আই. বি.তে বদলি হয়েছি। সেই সুখবরটাই দিতে এসেছিলাম। উঠি এবার, ফাইল ক্লিয়ার কর তুমি। এক কাপ চা-ও তো অফার করলে না! মিসেস এখানেই তো? গান-টান শোনা যাচ্ছে না যে বড়?

মুচকি হেসে বেরিয়ে গেলেন দ্বিজেন চক্রবর্তী।

দ্বিজেনের কথায় নীহারের নূতন ক'রে আবার মনে পড়ল, সত্যি, অস্তরা আজকাল বড় বেশি রকম নীরব হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত গানে হাসিতে পূর্ণ ক'রে রাখত সে বাড়িটা। আজকাল সাড়াশব্দই পাওয়া যায় না। বাড়ির কোন্ কোণে প'ড়ে থাকে, বোঝাই যায় না যেন। নিয়মমত কর্তব্য সমাপন ক'রে যায় নিজের ওজনে নিখুঁতভাবে। মনে হয়, ভেতরের মানুষটা কোথায় চ'লে গেছে। প'ড়ে আছে শুধু দেহ-যন্ত্রটা। যে অস্তরা একদিন তাঁর প্রেমে পড়েছিল,

সে অস্তরা কোথায় ? সে যে অন্তর্হিত—এ কথা নীহারের অন্তর্যামী যে বুঝতে পারে নি, তা নয়। কিন্তু অন্তর্যামী ছাড়াও মানুষের মনে আর একজন থাকে, যে অন্তর্যামীর কথা বিশ্বাস করতে চায় না, প্রমাণ চায়। নীহারের মনের এই দ্বিতীয় সত্তাটি প্রমাণ সংগ্রহ করতেও ব্যগ্র নয়। অন্তর্যামী-আহরিত নিগূঢ় সত্যটি তিনি কেবল অবিশ্বাস করতে চান। অস্তরা তাঁকে আর ভালবাসে না—এ কথা কিছুতেই মানতে চান না তিনি। ইদানীং কিছুদিন থেকে যদিও তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, অস্তরার সবটা তিনি পান নি, অস্তরার চরিত্রের মধ্যে এমন একটা কি আছে যা তাঁর আয়ত্তাতীত, যা কিছুতেই তাঁর নিজের নাগালের মধ্যে, তাঁর বিশেষ অধিকারের মধ্যে ধরা দেয় না, ইচ্ছে ক'রে যে লুকিয়ে রেখেছে তা নয়, অস্তরা সম্পূর্ণরূপেই নিজেকে দিয়েছে (নীহার এই বিশ্বাসটাকেই আঁকড়ে আছেন প্রাণপণে), তিনিই—নীহারই তাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করতে পারেন নি। সূর্যের কিরণ যেন। তাঁরই বাতায়ন-পথে এসে তাঁরই ঘর আলোকিত করেছে, তবু তাঁর নয়। বেলা শেষ হ'লেই চ'লে যাবে, রাখা যাবে না কিছুতে। আকাশ যেমন দিগন্তরেখায় পৃথিবীকে স্পর্শ ক'রে আছে মনে হয়, অথচ কত দূরে··· গাছের ফুলকে ছিঁড়ে এনে ফুলদানিতে, এমন কি 'বাট্‌নহোলে' গুঁজে রাখলেও ফুলের অন্তরতম সত্তায় প্রবেশ করা যায় না যেমন কিছুতে, অস্তরা সম্বন্ধে এই ধরনের একটা বোধ তাঁর হৃদয়কে আকুল ক'রে তোলে ; যদিও ইদানীং কিন্তু অস্তরা তাঁকে আর ভালবাসে না—এ কথা স্পষ্টভাবে কিছুতেই স্বীকার করতে চান না তিনি। অন্তর্যামীর মুচকি হাসির উত্তরে নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি জবাব দেন—আমি ওকে সম্পূর্ণরূপে পাচ্ছি না, সেটা আমার নিজেরই অক্ষমতা,.ও তো নিজেকে উজাড় ক'রেই দিয়েছে।—এই সিদ্ধান্তে এসে শান্তি পেলেন নীহার

সেন আবার। তাঁর অন্তরের সুনিভৃত অন্ধকার গুহায় বুভুক্ষু হিংস্র একটা পশুর দুই চক্ষে লেলিহান যে শিখাটা ধকধক ক'রে জ্বলছিল তা যে আরও প্রখর হয়ে উঠল, নীহার সেন টের পেলেন না সেটা। পাবার কথাও নয়। গুহাটার সামনে মার্জিত চিন্তাধারার ঠাসবুনোনি পরদাখানা ঝুলছিল। সেটা তুলে ধ'রে আত্মবিশ্লেষণ করবার উৎসাহ ছিল না নবীন ডেপুটি নীহার সেনের। সময়ও ছিল না। সামনে স্তূপাকার ফাইল। ছুটির দিন, তবু ছুটি নেই। নীহার সেন ফাইলে মন দিলেন।

পাশের ঘরে অন্তরা শুয়ে ছিল। ঘুমুচ্ছিল না, চোখ বুজে প'ড়ে ছিল। তার আপাত-স্থৈর্যের অন্তরালে যে তুমুল আলোড়ন চলছিল, তার ঠিক স্বরূপটা নিজেও সে ঠিক করতে পারছিল না। ভয়, কৌতূহল, স্বাধীনতা-স্পৃহা, চক্ষুলজ্জা, বিদ্রোহ, সামাজিক কর্তব্য, নীহারের প্রতি মমতা এবং বিতৃষ্ণা—বহু বিচিত্র পরস্পর-বিরোধী মনোভাব প্রবল হৃদয়াবেগের ঘূর্ণিপাকে তার মনে যে আবর্ত সৃষ্টি করেছিল, তার মধ্যে এমন কিছুই সে খুঁজে পাচ্ছিল না যা নির্ভরযোগ্য, যাকে অবলম্বন ক'রে সে দাঁড়াতে পারে সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তির বিরুদ্ধে। তুমুল ঝঞ্ঝার মাঝখানে অন্ধকারে সে ছুটে চলেছিল একটা সত্য আশ্রয়ের আশায়, যেখানে তার মন নির্ভয় হবে। যে ভিত্তির উপর সে তার স্বপ্ন-সৌধ নির্মাণ করেছিল, তা ন'ড়ে উঠেছে। স্বপ্ন-সৌধ ভেঙে পড়েছে। তাকেই আঁকড়ে থাকতে হবে তবু? নিজেকে বারম্বার এই একই প্রশ্ন ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে, কিন্তু থামতে পারছিল না। মনের ভিতর থেকে ক্ষীণকণ্ঠে একটা উত্তরও আসছিল, ঠিক উত্তর নয়, পালটা প্রশ্ন আর একটা—ত্যাগ করবে কোন্ অজুহাতে, ত্যাগ ক'রে যাবেই বা কোথায়? এ প্রশ্ন কিন্তু তার প্রথম প্রশ্নকে নিরস্ত করতে পারছিল

না কিছুতে। সঙ্গে সঙ্গে এও সে ভাবছিল, যা সে আপাতদৃষ্টিতে দেখছে, তাই কি নির্ভরযোগ্য? কিছুদিন আগে যে বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে সে নীহারের মধ্যেই জীবনের সঙ্গীকে আবিষ্কার করেছিল, সেই বিচার-বুদ্ধিটাই কি নির্ভরযোগ্য? স্বামীর কর্তব্যে নীহারের তো এতটুকু অবহেলা নেই, তাকে বিয়ে ক'রে বরং নিজের আত্মীয়সমাজে সকলের বিরাগভাজন হয়েছেন তিনি। কমিউনিস্ট হয়ে ক্যাপিটালিস্ট গভর্মেণ্টের অধীনে কেন তিনি চাকরি করছেন তার সপক্ষে নীহারের যুক্তির অভাব নেই, যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হ'লে শত্রুর সঙ্গেও আপোস করতে হয়। ক্যাপিটালিজ্‌মের সঙ্গে কমিউনিজ্‌মের পৃথিবীব্যাপী যে যুদ্ধ অহরহ চলেছে, এটা তার অংশমাত্র। বৃহত্তর উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রেখেই অধুনা ক্যাপিটালিজ্‌মের মিত্রের ভূমিকায় অবতরণ করতে হয়েছে কমিউনিস্টদের। এসব কথা নীহার বহু বার বলেছেন, সে বহু বার শুনেছে। এর যৌক্তিকতাও সে অস্বীকার করতে পারে নি—বস্তুত এ নিয়ে তর্কই করে নি সে, নীহার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বার বার নিজের যুক্তিটা আস্ফালন করেছেন তার কাছে কারণে-অকারণে। যুক্তির দিক দিয়ে এসব কথা অকাট্য হ'লেও অন্তরের অন্তস্তলে অযৌক্তিক কি যেন একটা বাষ্পাকারে উঠে আচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছে যুক্তির স্পষ্টতাকে। মনে হচ্ছে যুক্তিই কি জীবনের সব, জীবনযুদ্ধের কৌশল আয়ত্ত করাটাই মানব-জীবনের শেষ কথা, আর কিছু নেই? সামান্যতম পশুর আর বৃহত্তম মানুষের জীবন-দর্শনে কোন তফাত থাকবে না? এক-একবার এও মনে হচ্ছে, দাম্পত্যজীবনে রাজনীতিকে এত বড় স্থান দেওয়ার প্রয়োজন কি?…রাজনৈতিক মতবাদ থাকুক না বৈঠকখানার সুসজ্জিত সোফায় ব'সে…তর্কাতর্কি চলুক না সেখানে, তার আলোড়ন অন্তঃপুরের শান্তিকে বিঘ্নিত করবে

কেন? তখনই আবার ভাবছে, আমার এ দাম্পত্যজীবন যে ওই সূক্ষ্ম মতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত! সমাজের অন্তঃপুর আর এর অন্তঃপুরে আকাশ-পাতাল তফাত যে! এর সবটাই অন্তঃপুর, বৈঠকখানা নেই। সমাজ এ জীবন আমার ঘাড়ে জোর ক'রে চাপিয়ে দেয় নি, আমি নিজে জেনে এ জীবনকে বরণ করেছি। যে আদর্শ স্বপ্ন-জীবনকে মূর্ত করতে চেয়েছিলাম এত সাধ ক'রে, বাস্তবের এক আঘাতে সেই স্বপ্নটাই যদি চুরমার হয়ে গেল, তা হ'লে আর বাকি রইল কি? আদর্শ···স্বপ্ন···এই তো জীবনে চেয়েছি। কৌশল নয়, বিদ্যা নয়, বুদ্ধি নয়, রূপ নয়, অর্থ নয়, চেয়েছি মহত্ত্ব, বীরত্ব, আত্মত্যাগ। ডেপুটি-গৃহিণী হয়ে সকলের উপহাসের খোরাক যোগানোই যদি এর পরিণতি হয়, তা হ'লে লক্ষপতি ধনীর দুলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চডিগ্রীধারী যে নাদুস-নুদুস ব্যক্তিটির সঙ্গে তার বাবা প্রথমে সম্বন্ধ করেছিলেন, তার গলায় মালা দিলেই তো হ'ত। জীবন-যুদ্ধের আইন অনুসারে বেশি সঙ্গত কাজই হ'ত। কিন্তু তা না ক'রে সে রূপকথালোকের রাজপুত্রকে বরণ করেছিল···মিনুকে রাগের মাথায় অন্য কথা লিখলেও নীহার তার চক্ষে রূপকথালোকের রাজপুত্রই ছিল সেদিন, যে রাজপুত্র অসাধ্যসাধন করবে, ঘুমন্তপুরীকে জাগিয়ে তুলবে সোনার কাঠির স্পর্শ দিয়ে। জীবন-যুদ্ধের কৌশলে সেই রাজপুত্র সহসা রূপান্তরিত হয়ে গেল উপহাসাস্পদ কেরানীতে। হতে পারে না···কিছুতে হতে পারে না···

নীহার সেন তন্ময় হয়ে রায় লিখছিলেন। অসহায় কয়েকটা মুখ চোখের উপর ভাসছিল। অভাব—হ্যাঁ, অভাবই আসল কারণ, শুধু অর্থাভাব নয়, শিক্ষারও অভাব। লোকগুলোর চোখে পশুর দৃষ্টি, মানুষের নয়—ক্যাপিটালিস্ট সমাজের দুর্বল মানুষ-পশু। সুস্থ জীবন

যাপন করবার সুযোগ পায় নি, চুরি করতে হয়েছে···তা ছাড়া···ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত হ'ল নীহার সেনের। সত্যি লোকগুলো চুরি করেছে কি? ···একের পর এক এতগুলো লোক একবাক্যে যে কথা ব'লে গেল, উকিলের জেরায় টলল না, সে কথা বিশ্বাস করলে চুরি করেছে স্বীকার করতে হয়। এতগুলো লোকের কথা অবিশ্বাস করবার কোন হেতু নেই। কিন্তু মকদ্দমা দাঁড় করাবার জন্যে পুলিস যে মিথ্যে সাক্ষী সৃষ্টি করে, এ তো জানা কথা। সেদিন একজন পুলিস-অফিসার বলছিলেন, নিছক সত্যের উপর নির্ভর করতে গেলে কোন দোষীকে সাজা দেওয়া যায় না। আইনের এমনই গড়ন যে, দোষীকে সাজা দিতে হ'লেও সত্যের খানিকটা অপলাপ করতেই হবে। এই আইনের সহায়তা করেছেন তিনি! সাক্ষীর উপর যেখানে সব নির্ভর করছে, এবং সে সাক্ষী পুলিস যখন নিজের খুশিমত তৈরি করতে পারে তখন···অসহায় লোকগুলোর নিষ্প্রাণ দুর্বল দৃষ্টি আবার মনে পড়ল তাঁর···ওই দুর্বল দৃষ্টির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসারও কিছু আভাস ছিল।···সুযোগ পেলে ওরা প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না···হয়তো ওরা নির্দোষ। কিন্তু 'হয়তো'র উপর নির্ভর করতে গেলে কাজ চলে না। পৃথিবীতে সব আইনে ফাঁক আছে, সব নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। ট্রেনে কলিশন হয় জেনেও আমরা ট্রেনে চড়ি। বিবেকের তীক্ষ্ণ চঞ্চু ঠোকর মেরে মনে যে ক্ষতটা করেছিল, এ কথা মনে হওয়াতে তাতে একটা স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়ল যেন। না, এতগুলো সাক্ষীকে অবিশ্বাস করবার কোন হেতু নেই। ওদের পক্ষের উকিল তো কম জেরা করে নি! কলম চলতে লাগল নীহার সেনের। সব কটার সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে দিলেন। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল, যে ডেপুটি যত বেশি সাজা দিতে পারে, চাকরিতে তার নাকি তত বেশি উন্নতি হয়। দু-চারটে উদাহরণও মনে

পড়ল। পিওন চিঠি দিয়ে গেল। বাই জোভ, গুজব নয় তা হ'লে, সত্যিই সে রায় সাহেব হয়েছে। হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি মনটা শ্রদ্ধাগদগদ হয়ে উঠল···পর-মুহূর্তেই লজ্জা হ'ল, তখনই বিদ্রোহের সুর জাগল আবার···অনুপস্থিত প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য ক'রে মনে মনে আবৃত্তি করলেন—তুমি পাও নি, ঠাট্টা করছ তাই···আঙুর আর শিয়ালের গল্পটা মনে পড়ছে। এতে লজ্জারই বা কি আছে, আমি তো চাই নি, আমার যোগ্যতার জন্য যেচে ওরা দিয়েছে। ক্লাসে যেমন ফার্স্ট প্রাইজ পেতাম। আব একটা সুখবরও ছিল চিঠিতে। সদরে বদলি হয়েছেন তিনি। অন্তরা খুশী হবে বোধ হয়। এই মফস্বলের বুনো আবহাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠেছে বেচারা। তাই বোধ হয় অত মুষড়ে পড়েছে। আমি কাজকর্ম নিয়ে থাকি, ওর সঙ্গে গল্প করার পর্যন্ত সময় পাই না—ও-বেচারার সময় কাটে কি ক'রে! একটা রেডিও সেট কিনতে হবে এবার। এখনই উঠে গিয়ে অন্তরাকে সুসংবাদটা দিয়ে আসবেন কি না ভাবছিলেন, এমন সময় দরজাটা খুলে অন্তরা নিজেই এসে দাঁড়াল। চোখে অদ্ভুতরকম একটা উন্মুখ দৃষ্টি।

আমার একটা কথা রাখবে ?

কি ?

চাকরিটা ছেড়ে দাও তুমি। দেবে ?

মজ্জমান লোক যে আগ্রহভরে ভাসমান কাঠের টুকরোটাকে অপলকা জেনেও আঁকড়ে ধরতে যায়, সেই আগ্রহ ফুটে উঠল অন্তরার চোখের দৃষ্টিতে। আবেগভবে ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল।

নীহার সেন অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

১৬

মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অংশুমান চুপ ক'রে শুনছিল।

হাবৃৎজ্ বলছিলেন, ব্যাটনের আঘাতটা তোমার মাথায় লেগেছে, তুমি কষ্টও পেয়েছ খুব—এ কথা আমি মানছি। আমি শুধু তোমাকে সেই পুরাতন সত্যটা আবার নূতন ক'রে উপলব্ধি করতে বলছি যে, আমাদের অনুভূতির সীমানা বড় সংকীর্ণ। আমরা যতটা অনুভব করতে পারি, তার বাইরেও ঢের জিনিস আছে যা আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, যা আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর, তারও রূপ ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায়। সাধারণ আলো রূপান্তরিত হয় ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণমহিমায়, সামান্য একটা পরকলার ভিতর দিয়ে দেখলে। সুতরাং অনুভূতির বিশেষ একটা রূপকে আঁকড়ে ধ'রে কষ্ট পাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

কষ্ট পাচ্ছি যে। যা পাচ্ছি তা মানতেই হবে।

আনন্দও পেতে পার, যদি তোমার অনুভূতির তরঙ্গগুলোকে বিশেষ একটা পরকলার ভিতর দিয়ে চালিত করতে পার।

কোথায় পাব সে রকম পরকলা ?

তোমার মনের ভিতরই আছে। খুঁজে দেখ। পরকলা শুধু কাচেরই হয় না, মানসিকতারও হতে পারে। একটা বিশেষ ধরনের মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়ে গেলে যন্ত্রণাও যে আনন্দদায়ক হতে পারে, তার প্রমাণ স্যাডিজ্‌মে। বিকৃত মনোভাব হিসেবে ওটা অনেকের কাছে ধিক্কৃত, বিজ্ঞানের কাছে কিন্তু কোন কিছুই ধিক্কৃত নয়। তা ছাড়া ইতিহাসে যাঁরা মার্টার ব'লে পুজো পান, তাঁরা কোনও অলৌকিক

শক্তি-বলে শারীরিক বেদনাকে মানসিক বিলাসের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন হয়তো। তোমাদের দেশেই সেকালে রাজপুত-রমণীরা জহরব্রত করতেন, এখনও চড়কপূজোয় অনেকে পিঠের চামড়ায় লোহার বঁড়শী বিঁধিয়ে বাঁশের ডগায় ঝোলেন শুনেছি। এঁরা নিশ্চয়ই কোন উপায়ে যন্ত্রণাকে মাধুর্যে রূপান্তরিত করতে পারেন, তা না পারলে—

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন হার্‌ৎজ্‌।

দেখ, স্নায়ুতন্ত্রীগুলো আঘাতের তরঙ্গগুলোকে বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে মস্তিষ্কে বেদনা-বোধের কেন্দ্রে আলোড়ন তোলে, তাই না আমরা বেদনা বোধ করি। সেগুলো আনন্দ-বোধেব কেন্দ্রে গিয়ে আলোড়ন তুললেই আমরা আনন্দ বোধ করব। যোগাযোগ ঘটানো অসম্ভব কি?—ঘনসন্নিবিষ্ট চাপদাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন তিনি। ক্ষণপরেই আলো চকমক ক'রে উঠল চোখের দৃষ্টিতে।

দেখ, ফ্যারাডের স্বপ্নকে ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল ভাষা দিয়েছিলেন। তিনি অঙ্ক ক'ষে দেখিয়েছিলেন যে, আলো আর বিদ্যুৎতরঙ্গ একই জাতের জিনিস, একই ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিজ্‌মের বিভিন্ন রূপ—ইলেক্‌ট্রিকাল লাইন্‌স্‌ অব ফোর্স একটি মিডিয়মে মাত্র চলে, তার নাম ঈথর—যা সর্বব্যাপী, যা প্রত্যেক জিনিসের অণুপরমাণুর অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট, অনেকটা তোমাদের উপনিষদের ব্রহ্মের মত এই ঈথর প্রত্যেক জিনিসকে প্রত্যেকের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ক'রে রেখেছে—এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তরঙ্গ বহন করে এই ঈথরই। আমি হাতে-কলমে প্রমাণ করেছিলাম সেটা। এখন আমাদের অনুভূতির তরঙ্গগুলোকে যদি ইলেকট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক ওয়েভ ব'লে মনে কর—খুব সম্ভব তাই ওরা—তা হ'লে তাদের বহন করবার জন্যে স্নায়ুতন্ত্রীর প্রয়োজন নাও হতে পারে। সর্বব্যাপী ঈথর আছে। সুতরাং তার

সাহায্যে বেদনার কম্পনগুলোকে আনন্দ-বোধের কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সেই চেষ্টা কর তুমি। তোমাকে এই এক্স্পেরিমেণ্টটা করতে বলেছি এই জন্যে যে, আঘাত পেলেই তুমি যদি কাবু হয়ে পড়, তা হ'লে যে পথ তুমি বেছে নিয়েছ সে পথে অগ্রসর হতে পারবে না; কারণ যে পথেই তুমি চল না কেন, আনন্দই হ'ল প্রধান পাথেয়। তোমার সশস্ত্র শত্রু অজস্র আঘাত করবে—ওই ওদের একমাত্র শক্তি—ওদের আঘাতকে তুমি যদি আনন্দে রূপান্তরিত করতে পার, তা হ'লেই তোমার জয়। পারবে না কেন?—Theoretically it is quite possible। আকাশের ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক তরঙ্গ রেডিও সেটে ঢুকে শব্দতরঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে, বেদনার অনুভূতিই বা আনন্দের অনুভূতিতে রূপান্তরিত হবে না কেন মস্তিষ্কের মত অমন একটা বিস্ময়কর যন্ত্রে প্রবেশ ক'রে? চেষ্টা কর, হবে ঠিক।

হারৃৎজ্‌ চ'লে গেলেন।

অংশুমান অন্ধকারে চুপ ক'রে বিমূঢ়ের মত ব'সে রইল। অকারণে আচমকা মার খাওয়ার পর থেকে তার সমস্ত মন কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে। একটা হিংস্র পশুকে বন্দী ক'রেও লোকে তাকে এমন অকারণে মারে না। জেলে নাকি বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল! কয়েকজন কয়েদী নাকি জেলারকে তাড়া করে! ইলেক্‌ট্রিকের তার কেটে দিয়েছে! কর্তৃপক্ষের সন্দেহ, রাজনৈতিক বন্দীরাও সংশ্লিষ্ট আছে এতে। তাই এই শাসন।

একটা তপ্ত লৌহ-শলাকা কে যেন মাথার ভিতরে ঢুকিয়ে ঘোরাচ্ছে ক্রমাগত। ঘুরিয়েই চলেছে—একদণ্ড বিরাম নেই—অসহায় পশুর মত সহ্য করতে হচ্ছে—উপায় নেই কোনও।

আনন্দে রূপান্তরিত করতে হবে। অসম্ভব যে নয় তা সে নিজেই

জানে, কিন্তু নিজেকেও সে জানে যে! আঘাতের বদলে প্রতিঘাত করতে হয়—এই তার শিক্ষা। অপমানে জর্জরিত হয়ে দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রতিঘাত করবে ব'লেই সে একদা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, প্রবল বিরুদ্ধ-শক্তির নিষ্ঠুর চাপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবার সম্ভাবনা জেনেও। এই প্রত্যাশিত চাপে আর্তনাদ করছে কেন তবে? নির্বিকার থাকতে পারছে না কেন? নির্বিকারই থাকতে পারছে না যখন, আনন্দে রূপান্তরিত করবে কি ক'রে তাকে? হারৎজের এ উপদেশ পালন করবে কি ক'রে সে? পারলে যুদ্ধজয় সুনিশ্চিত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল সে। অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ পরে যখন সচেতন হ'ল, তখন নিজের ক্ষুদ্রতায় সে সঙ্কুচিত। অযোগ্য, অনুপযুক্ত। সামান্য পশু ছাড়া আর কিছু নয়। আঘাতের বদলে প্রতিঘাত দেবার অতিপরিমিত সামান্য শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি তার নেই, তাই হাহাকার ক'রে মরছে সারাক্ষণ। মত্ত মাতঙ্গের পদতলে নিষ্পিষ্ট কীটের মতই মরতে হবে এবার। কীটের মতই মনোভাব, কীটের মতই দুর্বল, কীটের মতই মরতে হবে। আত্মিক শক্তি—মহাত্মা গান্ধী যে শক্তির উপর আস্থাবান, হারৎজ্ যে শক্তির কথা ব'লে গেলেন, সে শক্তির চর্চা তো সে করে নি কোনদিন। তার সন্ধানও জানে না। যে আত্মিক শক্তির বলে মানুষ পশুত্বের স্তর ছাড়িয়ে ঊর্ধ্ব-লোকে উঠে গেছে…হঠাৎ দধীচির কথা মনে পড়ল—নিজের অস্থি দান ক'রে বজ্র নির্মাণ করেছিলেন… এটা কিসের রূপক?…অনেকক্ষণ এই কথাই ভাবলে সে। রূপকের মর্মোদ্ধার হ'ল না, সমস্ত অন্তর জুড়ে ঘনিয়ে উঠল একটা ক্ষোভ। যে ভারতবর্ষে তার জন্ম, সে ভারতবর্ষের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে। পাশবিক শক্তির তুচ্ছ আস্ফালনে মুগ্ধ হয়ে মনুষ্যত্বের

উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। পশু ছাড়া আর কিছু হয় নি সে। তাও অতিশয় হীন পশু···অতিশয় ছোট।

ছোট জিনিস তুচ্ছ নয়। আমি অদৃশ্য বিদ্যুৎতরঙ্গ ধরেছিলাম অতি ছোট একটি যন্ত্রের সাহায্যে। গ্যালিনার উপর সরু একটি তার···

আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখে প্রথমটা অবাক হয়ে গেল, তার পর সাহস হ'ল যেন। ঘোর অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল অন্ধকারে, নির্ভরযোগ্য আত্মীয়ের দেখা পেয়ে শুধু যে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তা নয়, ম্লানায়মান আত্ম-বিশ্বাসের জ্যোতিটাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল সহসা অন্তরে। মনে হ'ল, পারব।

জগদীশচন্দ্রও বললেন, ভারতবাসী তুমি, নিজেকে হীন ভাবছ কেন এতটা? তুমি হীন নও। অমৃতের পুত্র তুমি। আদিত্যবর্ণ পুরুষকে প্রত্যক্ষ করবার পূর্বে উপনিষদের ঋষিকেও তমসার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভয় কি, অন্ধকার থাকবে না, আলো দেখা দেবে, সত্যকে আশ্রয় ক'রে থাক শুধু।

সত্যকে?—সাগ্রহে ব'লে উঠল অংশুমান, কোন্‌টা সত্য ব'লে দিন আমাকে। কাকে আমি আশ্রয় করব, আমি আশ্রয় খুঁজছি।

সত্য কি, তা কেউ কাউকে ব'লে বোঝাতে পারে না। নিজে সেটা উপলব্ধি করতে হয়। যেটা মিথ্যা ব'লে মনে হচ্ছে, সেইটে পরিহার ক'রে চল শুধু। সত্য-সন্ধানের সেই একমাত্র উপায়। অনেক মিথ্যা সত্যের মুখোশ প'রে থাকে, তাদের চিনতে দেরি হয়, কিন্তু সন্ধানী বেশিদিন প্রতারিত হয় না। রূপে রূপে বহু রূপে যিনি বিচিত্র, জীবনে ও মরণে যিনি নিত্য, সেই স্বয়ম্প্রভ স্বতন্ত্র সত্যের নির্লিপ্ত রূপ দেখতে পাবেই, যদি তোমার নিষ্ঠা আর আকুলতা থাকে।

আমি যে পথের পথিক, সে পথেও কি এই আধ্যাত্মিক সত্যের প্রয়োজন? আমি চাই ক্ষমতা, শত্রুকে শাসন করবার শক্তি—

সত্যের কোন জাতিভেদ নেই। সত্যই শক্তি। আলোকে ভাসমান ধূলিকণা, পৃথিবীর অগণিত প্রাণী, আকাশের অসংখ্য প্রদীপ্ত সূর্য, শিকারের উপর ঝম্পনোন্মুখ শার্দূল, লজ্জাবতীর সঙ্কোচ, কুমুদিনীর নিশি-জাগরণ, বনচাঁড়ালের নৃত্য, উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন, চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত যা কিছু তা শক্তির বিকাশ, এবং তার মূলে আছে সত্য—একমেবাদ্বিতীয়ম্। তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ, তাও এরই মধ্যে নিবদ্ধ। কোন পথই এর বাইরে নেই। যম নচিকেতাকে বলেছিলেন—তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন···সকল দেবতা এঁর মধ্যেই প্রবিষ্ট—এঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। জড়, জীব, উদ্ভিদ, প্রাণী, বিদ্যুৎ, আলো—সমস্ত অনুশীলন ক'রে সকলের মধ্যে যে বিরাট ঐক্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে বুঝেছি যে, আপাতদৃষ্টিতে পরিবর্তনশীল ব'লে মনে হ'লেও অন্তর্নিহিত সত্য এক এবং অভিন্ন। এবং এ উপলব্ধি যাঁর হয়েছে, তিনি অজেয়।···

বলতে বলতে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে গুঞ্জন উঠল, যাচ্ছি যাচ্ছি, তোমারই কাছে, সত্যপথে অনিবার্য গতিতে—

তার পরদিন সকালেই অংশুমান খবর পাঠালে যে, সে দোষ স্বীকার করবে। তার স্বীকারোক্তি শুনতে এলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নীহার সেন। ঠিক আগের দিন তিনি সদরে বদলি হয়ে এসেছিলেন।

১৭

শেষরাত্রি।

ঘন কুয়াশায় চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ পূর্বেও যে পরিচিত ছিল, তা অবলুপ্ত হয়েছে। কুহেলিকা নয়, যেন প্রহেলিকা। জীবনের কোন লক্ষণ কোথাও নেই, বৈচিত্র্যহীন, সব একাকার। বিরাট একটা সাদা চাদর দিয়ে মৃতদেহকে মুড়ে রেখেছে যেন কে—চাদরটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অস্তমান শশীর পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় হাসি নেই, আছে সকরুণ আক্ষেপ। নীরব ভাষায় যেন বলছে, তোমরা যখন জাগবে তখন আমি থাকব না, আমার সময় ফুরিয়েছে, আমি চললাম। একটা সবেদন সান্ত্বনাও যেন ক্ষরিত হচ্ছে ম্লানায়মান সেই আলো থেকে। চন্দ্র অস্ত গেল। ধার-করা আলোর জ্যোতিটুকুও নির্বাপিত হ'ল। নিবিড় অন্ধকার। মনে হচ্ছে, সর্বগ্রাসী···কালের প্রবাহও থেমে গেছে···নিস্পন্দ অসাড় সব···বিরাট একটা অন্ধ জঠর গ্রাস ক'রে জীর্ণ করছে যেন চরাচর নিখিল বিশ্ব। আশার লেশমাত্রও আর অবশিষ্ট নেই ব'লে মনে হচ্ছে যখন, তখন অদ্ভুত কাণ্ড হ'ল একটা। তীক্ষ্ণ তীব্র সুরে বাঁশি বেজে উঠল অন্তরীক্ষে। সু-উচ্চ দেবদারুশাখাসীন শকুন্ত আলোকের অরুণাভাস দেখতে পেয়েছে পূর্বদিগন্তের চক্রবাল-রেখায়। এসেছে, সে এসেছে। নিস্পন্দ স্পন্দিত হ'ল, অসাড়ের সাড়া জাগল। নিষ্প্রাণ ঘুমন্ত পুরীতে লাগল যেন সোনার কাঠির স্পর্শ। সহস্রকিরণের সহস্র স্বর্ণশরজালে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কুয়াশার মোহ-আবরণ। স্বচ্ছ হতে স্বচ্ছতর হতে লাগল চতুর্দিক। পাহাড়ের চূড়া জাগল, দেখা দিল বনস্পতির শীর্ষদেশ, মন্দিরের ললাটে পড়ল আলোকের তিলক, কলরব ক'রে উঠল পক্ষীকুল বন থেকে বনান্তরে।

ফুল ফুটল, হাওয়া বইল, অনুরূপ বর্ণবিচ্ছুরিত শোভাযাত্রায় প্রবেশ করল আলোকের বিজয়-রথ। প্রভাত হ'ল।

১৮

মোটরের চারটে টায়ারই ফেটেছে।

পথের অনেকখানি জুড়ে ঘন ঘন লোহার পেরেক পোঁতা। আশেপাশে কোন গ্রাম নেই, চারিদিকে ধু-ধু করছে মাঠ। আমরা যে এই পথ দিয়ে যাব, তা কি ক'রে জানলে ওরা, কে ওদের খবর দিলে ?—ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে একটু বিস্মিত হবার চেষ্টা করলেন নীহার সেন। ড্রাইভার টায়ার মেরামত করছিল, একটু ঝুঁকে সেটাতে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলেন, পট ক'রে হাফপ্যাণ্টের বোতাম ছিঁড়ে গেল একটা। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে ঘাড় কপাল মুছলেন ভাল ক'রে। হাতঘড়িটা দেখলেন একবার। আর একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। সহসা চোখের উপর হাতটা একবার বুলোলেন, বুলিয়েই ভুলটা বুঝতে পারলেন। ছবিটা চোখের সামনে নেই, মনের ভিতর আঁকা হয়ে গেছে। কতকগুলো পা, মোটর-লরি থেকে ঝুলছে—মড়ার পা। মিলিটারির গুলিতে মরেছে। মোটর-লরিতে বোঝাই ক'রে এই কিছুক্ষণ আগে সেগুলোকে ফেলে আসা হ'ল ওই নদীতে। প্রকাণ্ড মাঠটার ওপর দিয়ে ব'য়ে গেছে নদীটা। সেই দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন নীহার সেন। যদিও নদীটা দেখা যাচ্ছিল না, দেখা যাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তবু চেয়ে রইলেন। পাগুলো ঝুলছিল—দশ-বারোটা পা। হঠাৎ রাগ হ'ল—অনির্দিষ্ট ধরনের রাগ। তার পর সেটাকে নির্দিষ্ট করবার চেষ্টা করলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকেই কেন

এ অপ্রীতিকর কাজটা দিলেন এত লোক থাকতে? তাঁকে বদলি ক'রে আনার কি দরকার ছিল মফস্বল থেকে? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলছিলেন, তিনি বেশি কার্যদক্ষ—ক্রাইসিসের সময় 'এফিশেণ্ট' অফিসার দরকার। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, মিলিটারিদের গুলি চালাবার হুকুম দেওয়া ছাড়া দক্ষতা দেখাবার আর কোন উপায় নেই। সত্যিই নেই, সবাই কেমন যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—জেলের কয়েদীরা পর্যন্ত। দু-দুজন জেলের অফিসারকে খুন ক'রে পুড়িয়ে ফেলেছে, ফায়ার করবার অর্ডার না দিলে কি রক্ষা ছিল কারও? সমস্ত জেলখানাটা পুড়িয়ে ফেলত। জন চল্লিশ মরেছে—বেশ হয়েছে—ক্রিমিনাল গুণ্ডা যত। আর একটু রাগবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু পাগুলো আবার ভেসে উঠল চোখের সামনে—দ্রুত ধাবমান লরির পিছন থেকে ঝুলছে। রাগটা একটু ফিকে হয়ে গেল। মনে হ'ল, কই, এতদিন তো ওরা বিদ্রোহ করে নি, নিশ্চয় রাজনৈতিক বন্দীদের ষড়যন্ত্র আছে এর মধ্যে। অংশুমানের মুখটা মনে পড়ল। অদ্ভুত ছেলে! চোখের দৃষ্টিতে কোন উদ্বেগ নেই, ভয় নেই, উত্তেজনা নেই। পরিপূর্ণ শান্তিতে স্নিগ্ধ সে দৃষ্টি। নির্বিকার চিত্তে স্বীকার করলে যে, ডেপুটির অমানুষিক অত্যাচারে বিচলিত হয়ে সে তাকে পুড়িয়ে মারবার ষড়যন্ত্র করেছিল প্রতিশোধ নেবার জন্যে। এর জন্যে সে একটুও অনুতপ্ত নয়, এতদিন মিথ্যে কথা ব'লে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে ব'লেই সে অনুতপ্ত। তার মৃত্যুর জন্যে সে-ই সম্পূর্ণ দায়ী, আর কাউকে জড়াতে সে চায় না। অকম্পিত কণ্ঠে স্বীকার করলে যে, সে একাই দায়ী; অকম্পিত হস্তে সই ক'রে দিলে স্বীকার-পত্রে। মুখের ভাব শান্ত, স্নিগ্ধ। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার উপায় নেই এদের। আগেও অনেকবার দেখেছিলেন একে তিনি, কতবার তাঁর বাড়িতেই এসেছে। মুখচোরা

ভালমানুষ ব'লে মনে হ'ত। ভাবতেই পারা যায় নি তখন যে, এই লোক আগস্ট-ডিস্টার্বেন্সের পাণ্ডা হয়ে জলজ্যান্ত একটা লোককে পুড়িয়ে ফেলতে পারে। এতদিন ধ'রে ক্রমাগত দোষ অস্বীকার ক'রে এসেছে—হিমসিম খেয়ে গেছে এতগুলো ঝানু দারোগা। সবাই হার মানল যখন, তখন হঠাৎ নিজে যেচে দোষ স্বীকার করছে। অদ্ভুত! ভয় পেয়ে করছে যে, চোখের দৃষ্টি থেকে তা মনে হয় না। মিলিটারি ফায়ারিং হবার আগেই স্বীকার করেছে। না, ভয় নয়—আসলে ওরা··· আর একটু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চিন্তা করতে লাগলেন, এই ধরনের লোককে ঠিক কোন্ শ্রেণীতে ফেললে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না। কারও প্রতি অবিচার করতে চান না নীহার সেন, প্রত্যেক জিনিসকে ঠিক প্রপার পার্স্পেক্টিভে ফেলে বিচার করাই তাঁর রীতি—একটু ভেবে তাই ঠিক করলেন, না, ঠিক ক্রিমিনাল ওরা নয়, বাহাদুরি করবার জন্যেও এসব করে নি, আসলে ওদের মনের সমতা নেই, আন্ব্যাল্যান্স্ড্ মাইণ্ড—এরাই বোধ হয় পাগল হয় শেষ পর্যন্ত। একটু দুঃখ হ'ল—ছেলেটা পড়াশোনায় ভাল ছিল নাকি···

আর কত দেরি হে?

এখনও বহুৎ দেরি হুজুর। চার-চারটে টায়ার—। হাসিমুখে জবাব দিলে ড্রাইভার।

আকাশে বেশ মেঘ করেছে। ঘন-নীল পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। ছেলেবেলার একটা কথা মনে প'ড়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তাঁদের একটা ময়ূর ছিল। মেঘ দেখলে ময়ূরটা পেখম তুলে নাচত, আর নাচত তাঁর ছোট বোন মালতী। গানও গাইত একটা হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে—আয় বৃষ্টি হেনে, ছাগল দেব মেনে। ময়ূরটা উড়ে পালিয়ে গেল একদিন। মালতীও মারা গেছে। হঠাৎ মনে হ'ল, বৃষ্টি হবে নাকি? আকাশের

দিকে চাইলেন একবার। শঙ্কা ঘনিয়ে এল চোখের দৃষ্টিতে। অসহায়-ভাবে চারদিকে চাইলেন—ধু-ধু করছে ফাঁকা মাঠ—কোথাও আশ্রয় নেই—মনে হ'ল, আশ্রয় থাকলেও কেউ কি অভ্যর্থনা করত তাঁকে? মোটরে উঠে বসলেন।

আকাশে বহু বিচিত্র মেঘ থাকলে আকাশটা যেমন চোখে পড়ে না, তেমনই নানা চিন্তার ভিড়ে আসল চিন্তাটা আড়ালে প'ড়ে ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। অম্বরা চ'লে গেছে। কোথায়, কেন, কিছুই ব'লে যায় নি। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অপটুভাবে শিস দেবার চেষ্টা করলেন। হু-হু ক'রে ঠাণ্ডা বাতাস উঠল একটা।

১৯

চাকরি ছাড়ার প্রস্তাবটাকে লঘু-হাস্যভরে উড়িয়ে দিলেন যখন নীহার সেন, তখন অম্বরার দাম্পত্য-নীড়ের শেষ খড়টুকুও যেন উড়ে গেল। যে ডালে সে নীড় ছিল, সেই ডালটাকে আঁকড়ে থাকবার আর কোন অজুহাত সে আবিষ্কার করতে পারলে না। সেটা ভদ্রভাবে ত্যাগ ক'রে যাওয়াই স্বাভাবিক ব'লে মনে হ'ল তার। আদর্শকেই সে বরণ করেছিল, নীহার সেনকে নয়। নীহারের চেয়ে দেশই তার কাছে বড়। কোন ইজ্‌মের খাতিরে সে দেশদ্রোহী হতে পারবে না। প্রথম যৌবনে কমিউনিজ্‌মের যে স্বপ্ন তার কল্পলোকে মূর্ত হয়ে ছিল, তা আজও অম্লান আছে—সে কমিউনিজ্‌মের ভিত্তি দেশ—দেশেরই দরিদ্র জনসাধারণ। তাদের উপর গুলি চালাবার, তাদের অবলা নারীদের ধর্ষণ করবার যে যুক্তি নীহারকে মুগ্ধ করেছে, সে যুক্তি নিয়ে

নিজের মতে নিজের পথে সে একাই চলুক। প্রত্যহের কুশাঙ্কুর সহ্য ক'রে সে ও-পথে সঙ্গী হতে পারবে না।...

একটা ছোট স্যুটকেসে নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সে গুছিয়ে নিলে। স্যুটকেসটা পরে ফেরত দিলেই হবে। কিছু টাকাও নিয়ে যাচ্ছে, সেটাও ফেরত দিতে হবে। চিঠিও লিখতে হবে একটা পরে। নীহার নিজের পথে স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাক, আমি স'রে দাঁড়ালাম তার স্বাধীনতায় বাধা দিতে চাই না ব'লে—এই সব লিখতে হবে।—আরও অনেক কথা লিখতে হবে।...

রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু নীহারের কথাই মনে হতে লাগল বার বার। বিদ্বান বুদ্ধিমান তর্কপটু রাজনৈতিক নীহারকে নয়। সেই অসহায় পুরুষটাকে, যার অন্তরা না থাকলে এক দণ্ড চলে না; তাকে, যে দাড়ি কামিয়ে বুরুশটা ধুতে ভুলে যায়, হাতঘড়িটা হারায় ক্ষণে ক্ষণে, আপিসের কাগজ কোথায় রাখে ঠিক থাকে না। মনে পড়ছিল, মায়া হচ্ছিল; কিন্তু আর ফিরবে না সে। মা-বাবাকেও সে কম ভালবাসত না, কিন্তু নীহারের জন্য তাদেরও ছেড়ে এসেছিল একদিন। আদর্শের জন্যেই নীহারকেও ত্যাগ করতে হ'ল। কষ্ট হচ্ছে—কিন্তু সে আর ফিরবে না। স্টেশনের দিকেই চলেছিল সে হাঁটাপথে। কোথায় যাবে ঠিক ছিল না। কলকাতায়ই যাওয়া যাক আপাতত। হঠাৎ মনে হ'ল, তার আদর্শকে রূপ দেবে কে? অংশুমান? সে তো নাগালের বাইরে, জীবনে আর হয়তো দেখাই হবে না। হঠাৎ বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল। গতিবেগ বাড়িয়ে দিলে সে—দ্রুতবেগে চলতে লাগল অসমতল কঙ্করাকীর্ণ পথে। সমস্ত দেহ-মন একাগ্র হয়ে উঠল যেন। কেন, কিসের উদ্দেশ্যে, তা সে বুঝতে পারলে না। চলতে লাগল শুধু, দ্রুতবেগে চলাটাই একমাত্র করণীয় ব'লে মনে হ'ল।

যেতে হবে—কোথায় সে আদর্শলোক জানা নেই—তবু যেতে হবে। চলতে লাগল। অনির্দিষ্ট নামহীন একটা আকর্ষণ দুর্নিবার বেগে টেনে নিয়ে চলল তাকে।

মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে কিন্তু যে হাহাকারটা প্রচ্ছন্ন ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে স্পষ্টভাবে অনুভব করতে লাগল, জীবনে সে কাউকে ভালবাসতে পারে নি, এক নিজেকে ছাড়া। সে ভালবাসা চেয়েছে, ভালবাসা পেয়েছে ব'লে ভান করেছে, মাঝে মাঝে উতলা হয়েছে, স্বপ্নের ঘোরে স্বপ্নকে জড়িয়ে ধরতে গেছে—কিন্তু আসলে পায় নি কিছু। সত্যি যদি ভালবাসা পেত, তা হ'লে কেরানী স্বামী নিয়েও সুখী হ'ত সে। ভালবাসার স্পর্শে দাসত্বও মহনীয় হয়ে উঠত। হৃদয়-সিংহাসন শূন্যই আছে, কোনও মহারাজার স্পর্শে ধন্য হয় নি তা এখনও। কোথায় সে মহারাজা, কবে আসবে, কোন্ গুণে চেনা যাবে তাকে? একটি গুণই তো সে চেয়েছে সারা প্রাণ দিয়ে, সারাজীবন শ্রদ্ধেয় হবে সে—যার পায়ে সমস্ত দেহ-মন উজাড় ক'রে দেবে, তার মহত্ত্ব যেন মেকি না হয়—দুদিন যেতে না যেতেই তার গিলটি ধরা না পড়ে। বিদ্বান নয়, বুদ্ধিমান নয়, ধনী নয়, রূপবান নয়, সে চেয়েছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে—যার মহত্ত্বের ঔজ্জ্বল্যে মরচে পড়বে না কখনও। তখনই মনে হ'ল, তার নিজের কি এমন গুণ আছে যে, এমন খাঁটি সোনার দাবি সে করতে পারে অসঙ্কোচে? কি মূল্য দেবে সে—এর যোগ্য মূল্যই বা কি? মনের ভিতর থেকে উত্তর এল, আত্ম-ত্যাগ। আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে সে। কিন্তু কোথায়—কি ভাবে?···

আরে, রোকো রোকো···

গর্জন ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল মোটরটা।

মিসেস সেন? কোথায় চলেছেন? আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম যে আমি।

মোটর থেকে নামলেন ইন্‌স্পেক্টর দ্বিজেন চক্রবর্তী।

এক মুখ হেসে প্রশ্ন করলেন, কোথায় চলেছেন?

এই ট্রেনে কলকাতা যাব।

ও, তা হ'লে তো আরও সুবিধে হ'ল। আমিও যাচ্ছি কলকাতা। ট্রেনের এখনও দেরি আছে আধ-ঘণ্টাটাক। স্টেশনে যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখাটা সেরে যাব ভেবেছিলাম। আপনিও কলকাতা যাচ্ছেন, ভালই হ'ল। আসুন তা হ'লে, উঠুন। স্টেশনেই যাওয়া যাক সোজা—

আমার সঙ্গে কি দরকার আপনার?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে অন্তরা। তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল একটু।

ব্যাপার ইণ্টারেস্টিং—ধীরে সুস্থে বলব এখন। সঙ্গেই তো যাচ্ছেন। উঠুন। আপনার জিনিসপত্র কই?

এই ব্যাগটা ছাড়া আর কিছু নেই।

আসুন। মিস্টার সেন সদরে জয়েন করেছেন গিয়ে?

হ্যাঁ।

আপনি যাচ্ছেন কবে?

আমার কলকাতায় একটু দরকার আছে। সেটা সেরে তার পর যাব।

আই সি। আসুন।

ট্রেন ছুটে চলেছে অন্ধকার ভেদ ক'রে। ঠিক আগের স্টেশনে কামরাটা খালি হয়ে গেছে। ইন্‌স্পেক্টর দ্বিজেন চক্রবর্তী ও অন্তরা

ছাড়া কামরায় আর কেউ নেই। একটা কপাট খারাপ, ভাল ক'রে বন্ধ হয় না। দ্বিজেনবাবু সেটাকে ভাল ক'রে খুলে দিয়ে তার সামনেই বসেছেন নিজের ট্রাঙ্কের ওপর, ভালভাবে হাওয়া পাবেন ব'লে। তাঁর মনে হ'ল, এইবার কথাবার্তা শুরু করা যাক, পরের স্টেশনে আবার লোক উঠবে হয়তো।

একটা কথা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে মিসেস সেন। আই হোপ, ইউ উইল স্পিক দি ট্রুথ—অংশুমান বাবুকে আপনি কি সাহায্য করেছিলেন কিছু ?

অন্তরার চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল।

সাহায্য ? কি রকম সাহায্য ?

আর্থিক।

না।

ক্ষণকাল নীরব থেকে দ্বিজেন চক্রবর্তী বললেন, আমরা কিন্তু একটা বাড়ি সার্চ ক'রে এক সেট জড়োয়া গয়না পেয়েছি, তার প্রত্যেকটাতে নাম খোদাই করা আছে—অন্তরা সেন।

অন্তরার মুখ শুকিয়ে গেল। তবু সে সপ্রতিভ হাসি হেসে বললে, আমি ছাড়া পৃথিবীতে অন্য অন্তরা সেন থাকাও সম্ভব।

কোয়াইট, খুবই সম্ভব। আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু যে দোকান গয়নাগুলো বিক্রি করেছে, গয়নার গায়ে দোকানের নামও ছিল, সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে, এক আপনি ছাড়া অন্য কোন অন্তরা সেনকে গয়না বিক্রি করে নি তারা।

আমার সে গয়নার স্যুট চুরি হয়ে গেছে।

কবে ?

ঠিক মনে নেই।

পুলিসে খবর দিয়েছিলেন?

না।

দেন নি কেন?

পুলিসের ওপর আস্থা নেই ব'লে।

আপনার স্বামী কি এই চুরির কথা জানতেন?

তিনি রাগারাগি করবেন—এই ভয়ে তাঁকেও জানাই নি।

দ্বিজেন চক্রবর্তীর মুখ হাস্য-প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি থেকে উঁকি দিতে লাগল প্রচ্ছন্ন কৌতুক। পর-মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। আড়চোখে চেয়ে দেখলেন, অন্তরার দৃষ্টিতে আগুন জ্বলছে। এক ঝলক হেসে বললেন, কিন্তু আপনার বান্ধবী কমরেড মিনা দত্তকে এসব কথা লেখেন নি তো?—সে চিঠিখানাও দেখেছি আমি।

অন্তরার চোখ দুটো দপ ক'রে জ্ব'লে উঠল।

দ্বিজেনবাবু বললেন, আই অ্যাম সরি, কিন্তু আপনাকে অ্যারেস্ট করতে হ'ল। কর্তব্যের খাতিরে, বিলিভ মি। মিস্টার সেন, আই হোপ, উইল অ্যাপ্রিসিয়েট মাই লাভ ফর ডিউটি।

একটা ক্রুর হাসি ফুটে উঠল চোখ দুটোতে। অন্ধকার ভেদ ক'রে ট্রেন ছুটতে লাগল।

২০

অন্ধকারে একা ভাবছিল অংশুমান।

...ওরা ছাড়বে না, প্রতিশোধ নেবে। বার বার নিয়েছে, এবারও ছাড়বে না। ছাড়বে না, কারণ ওরাও ভীত। ভীত বন্য বরাহ যেমন দুরন্ত বেগে তেড়ে আসে, নখদন্ত বিস্তার ক'রে বাঘ যেমন সগর্জনে

ঝাঁপিয়ে পড়ে আততায়ীর বুকে, সাপ যেমন ফণা তোলে, এরাও তেমনই নিষ্ঠুরভাবে নির্মূল করবে আমাদের। ভয় পেয়েছে ব'লেই অস্ত্র চালাবে, চোর যেমন ছোরা চালায়। না, ছাড়বে না। কখনও ছাড়ে নি। ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে।—

…গাছের ডালে ডালে মড়া ঝুলছে। ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

…হাত-পা বাঁধা সারিবদ্ধ সিপাহী। একের পর এক গুলি করা হচ্ছে। মড়ার স্তূপ। ছুটো কূপ পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

…প্রকাণ্ড একটা কামান দাগা হ'ল। আওয়াজটা হ'ল চাপা গোছের, সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ল চতুর্দিকে মাংসের টুকরো, কাটা আঙুল, রক্তাক্ত হাত-পা, ঝলসানো থ্যাতলানো মাথা। কামানের ভিতর মানুষ পুরে কামান দাগা হয়েছে।

…একটা পোড়া দুর্গন্ধ উঠছে চতুর্দিকে। একটা জীবন্ত লোককে হাত-পা বেঁধে মন্দ আঁচে ধীরে ধীরে পোড়ানো হচ্ছে। তার আগে তাকে প্রহার করা হয়েছে প্রচুর। বেয়নেটের খোঁচায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত।

…একটা লম্বা ঘরে সারি সারি শোয়ানো আছে হাত-পা বাঁধা অপরাধীরা। সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তপ্ত লোহা দিয়ে আপাদমস্তক দেগে দেওয়া হচ্ছে সকলের একে একে। চড়চড় ক'রে শব্দ হচ্ছে— তপ্ত লোহায় কাঁচা মাংস পুড়ছে। নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে সকলে। আর্তনাদ যখন বিরক্তি উৎপাদন করতে লাগল, তখন গুলি চালিয়ে নীরব ক'রে দেওয়া হ'ল তাদের।

…মুসলমানের মুখে জোর ক'রে মাখানো হচ্ছে শূকরের চর্বি, শূকরের চামড়ায় পুরে সেলাই করা হচ্ছে তাদের, তার পর হত্যা করা হচ্ছে নির্মমভাবে। ফাঁসি দিয়ে, গুলি ক'রে, কামানের ভিতর পুরে,

পুড়িয়ে, ঠেঙিয়ে—যেমন খুশি। হিন্দুর বেলাতেও ঠিক অনুরূপ আচরণ। আগে ধর্ম নষ্ট, তার পর অপমান, তার পর হত্যা।

দিল্লী শ্মশান হয়ে গেছে। একটি পুরুষ নেই। সব মরেছে। হাজার হাজার গৃহহীন স্ত্রীলোক আর শিশু ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে। সৈন্যরা ঘরে ঘরে ঢুকে লুঠ করেছে···

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরেজ রাজপুরুষেরা যেভাবে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন, তার এই সব বর্ণনা ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাই* নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। ভয়াবহ বর্ণনা। অনেকদিন আগে পড়েছিল। প্রতিটি বর্ণনা মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল চোখের সামনে। এ দেশের লোককে লাথি মেরে, চাবকে, জেলে পুরে, গুলি ক'রে, ফাঁসি দিয়ে, আগুনে পুড়িয়েও তৃপ্তি হয় নি এদের। একজন লিখছেন—আমার যদি আইনত ক্ষমতা থাকত, জীবন্ত অবস্থায় এদের চামড়া ছাড়িয়ে নিতাম। তার পর দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, কাবুল বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহও দমন করেছিল এরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে, হাজার হাজার লোক হত্যা ক'রে। শক্তিমান জাতি, প্রতিশোধ নিতে এরা ছাড়ে না। জালিয়ানওয়ালাবাগ, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর—ভারতবর্ষের প্রত্যেক জেলের সেলে সেলে···। সহসা চিৎকার ক'রে ব'লে উঠল অংশুমান, তবু ভয় খাব না, তবু অন্যায় সহ্য করব না, আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য আমরা নেবই। ব'লে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল—কোথাও কেউ নেই। চুপ ক'রে ব'সে রইল অনেকক্ষণ। অন্ধকার—কেবল অন্ধকার। এত অন্ধকার কেন? একটু আলো, এতটুকু আলো পেলে যে বেঁচে যায় সে! কোথাও আলো নেই।

* *The Other Side of the Medal* by Edward Thompson.

চোখের সামনে অন্তরের নিবিড় গহনে কেবল অন্ধকার। ঘন গাঢ় পুঞ্জীভূত তমিস্রা। মৃত্যুর আঁধার এখনই নামল নাকি ?

শান্ত স্তব্ধ হয়ে চোখ বুজে ব'সে ছিল অংশুমান। চোখের সম্মুখে প্রসারিত তিমির-যবনিকা সামান্য একটু কাঁপল যেন, ক্ষীণ একটু আলোর আভাস দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।—আবার অন্ধকার—একটু পরেই আবার সেই আলোর আভাস, এবার যেন একটু বেশিক্ষণ স্থায়ী—আবার মিলিয়ে গেল তাও। একাগ্র আগ্রহে স্তব্ধ নিমীলিত নেত্রে ব'সে রইল অংশুমান। প্রদীপের শিখার মত ওই যে—স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল ক্রমশ—কম্পিত শিখা স্থির হ'ল। সহসা সে শিখা থেকে আবির্ভূত হলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। বললেন, ভয় কি, আমি আছি। অন্ধকার মিথ্যা।

কে আপনি ?

আমি নির্বাণ অগ্নি। তোমার মধ্যে চিরকাল আছি এবং থাকব। ভয় আমাকে আবৃত করে, কিন্তু ধ্বংস করতে পারে না। ভয় অপসারিত কর, আমাকে দেখতে পাবে। ভয়ই অন্ধকার।

ধীরে ধীরে শিখার মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন আবার।

অংশুমানের কানে কানে কে যেন বলতে লাগল, আমি দাবানল, আমিই বাড়বানল, আমিই আবার কৃশানু। মৃন্ময় প্রদীপের ভীরু কম্পিত শিখায়, বিদ্যুতের উজ্জ্বল প্রকাশে, ইন্দ্রের বজ্রে, মদনের কুসুমশরে, নক্ষত্রের কিরণে, খদ্যোতের দীপ্তিতে, তপস্বীর তপস্যায়, প্রেমিকের প্রেমে, কবির প্রেরণায়, বীরের বীরত্বে, বৃক্ষে লতায় জড়ে চেতনে অণুতে পরমাণুতে সর্বত্রই আমার প্রকাশ। ইলেকট্রনের যে রূপে তোমরা বিস্মিত, তা আমারই রূপ। নেগেটিভ ইলেকট্রন

চিরকালই পজিটিভের দিকে ধাবিত। আমারই এক অংশ আর এক অংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ হতে চায়। স্বাহা আজও আমার অনুগামিনী, তাই পৃথিবী অজর অমর অক্ষয় শাশ্বত—

নিস্তব্ধ হয়ে গেল সব।

ধীরে ধীরে গুঞ্জন উঠল—যাচ্ছি—যাচ্ছি—তোমারই কাছে অনিবার্য গতিতে—সত্য পথে—

২১

তিন মাস কেটে গেছে।

সব রকম চেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছে। অংশুমানকে পাগল প্রতিপন্ন করা যায় নি। হাইকোর্টের বিচারেও তার প্রাণদণ্ড বাহাল আছে। প্রাণভিক্ষা চেয়ে একটা দরখাস্ত করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন হিতৈষীরা। অংশুমান তাতে সই করে নি। অংশুমানের বাবা পুত্রের জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলেন রাজদরবারে। মঞ্জুর হয় নি। কাল ভোরে অংশুমানের ফাঁসি হবে। জেলারবাবু এসে প্রবেশ করলেন।

আপনার শেষ ইচ্ছা যদি কিছু থাকে বলুন, তা আমরা সম্ভব হ'লে পূর্ণ করতে চেষ্টা করব। মানে, যদি কারও সঙ্গে দেখা-টেখা করতে চান—

কার সঙ্গে দেখা করবে সে? মা বাবা? কি হবে তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে? তাঁরা তো খালি কাঁদবেন! অজানা পথে অশ্রুর পাথেয় নিয়ে কি করবে সে? হঠাৎ মনে হ'ল যদি—

একজনের দেখা পেলে সুখী হতাম, কিন্তু তা কি সম্ভব হবে এখন?

কার সঙ্গে বলুন, চেষ্টা করতে পারি।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নীহার সেনের স্ত্রী অস্তরা দেবীর সঙ্গে।

তিনিও তো আপনার সঙ্গেই যাচ্ছেন।

মানে?

সবিস্ময়ে চেয়ে রইল অংশুমান।

কাল তাঁরও ফাঁসি হবে।

কেন, কি করেছিল সে?

একজন পুলিস অফিসারকে ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে খুন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন? দেখি—

জেলারবাবু বেরিয়ে গেলেন।

২২

সেদিন পূর্ণিমা। শেষ রাত্রি। সামনেই ফাঁসির মঞ্চ। অন্তরা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। অংশুমান মৃত্যুর কথা ভাবছিল না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সে। অনাবিল জ্যোৎস্নায় মহাকাশ পরিপ্লাবিত। পৃথিবীর ধূলিতে লেগেছে আকাশের স্পর্শ, জেগেছে অনাগতলোকের স্বপ্ন। রূপসাগরের কানায় কানায় অপরূপ সৌন্দর্য-সুধা যেন টলমল করছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উড়ে যেতে চাইছে যেন পৃথিবীর দৃষ্টির ওপারে চক্রবালরেখা ছাড়িয়ে। ওটা মেঘ নয়—নৌকোর পাল··· ভারতের স্বর্গীয় অমরবৃন্দ বোধ হয় যাত্রা করেছেন আজ মর্ত্যের দিকে··· ক্ষুদিরাম-কানাইলালের দল···ওটা তাদেরই পাল-তোলা নৌকো—পালে লেগেছে পারিজাতগন্ধী হাওয়া—দুলছে তাতে নন্দনবনের মন্দারমঞ্জরী···

॥ শেষ ॥